কাগজের নৌকা

সুবোধ ঘোষ

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিঃ
৮-সি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

এই লেখাগুলি গত তিন বৎসরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। দৃশ্যতঃ লেখাগুলির সবই প্রবন্ধ নয়। কিন্তু গল্পের রূপেই হউক্ আর বৃত্তান্তের রূপেই হউক্—মূলতঃ লেখাগুলি সবই প্রবন্ধ। অনেকগুলি লেখা রবিবারের আনন্দবাজার পত্রিকায় "কাগজের নৌকা" শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তকটিকেও সেই নাম দেওয়া হইল।

লেখক

সূচীপত্র

একটি যাদুঘরের কাহিনী

দিল্লী নগরী। মধ্যাদিনের সূর্য কিছুক্ষণ হয় উত্তপ্ত কুতুবের শীর্ষরেখা থেকে পশ্চিমে সরে এসেছে। চারিদিকের পরিব্যাপ্ত জনপদমুখরতার মধ্যেও হুমায়ুনের সমাধি একেবারে শান্ত, একখণ্ড সুন্দর শিলীভূত দিবাস্বপ্নের মত। অশোকস্তম্ভের মসৃণ লৌহ ক্ষণিকের জন্য আভাময় হয়ে ওঠে। ইন্দ্রপ্রস্থের মাঠে একটা সঙ্গীহীন ঘূর্ণি-হাওয়া হঠাৎ ক্ষুব্ধ হয়ে দূরান্তরে দৌড়ে চলে যায়। সন্দেহ হয়, ওটা ঠিক ঘূর্ণি-হাওয়া নয়; একটা ঐতিহাসিক অভিমানের শরীর—অস্পষ্ট ও অবয়বহীন, মাত্র একটা দীর্ঘশ্বাসের জোরে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ আকাশে একটা গুরু গুঞ্জন শোনা যায়। ব্রিটিশ জঙ্গী-বিমানবহরের একটি দুরন্ত ইয়র্ক বায়ুপুঞ্জে ডুবসাঁতার দিয়ে মাটিমাখা মহীতলে নেমে আসছে। ভারতের নতুন বড়লাট লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন আসছেন। পালামপুর বিমানবন্দরে রাজপুত রাইফেলস্ সার বেঁধে দাঁড়ায়। সম্বর্ধনার আবেগে সুতীক্ষ্ণ সঙ্গীনের ফলক চকচক্ করে। এক দুই তিন···বার বার একত্রিশ বার তোপধ্বনি গুমরে ওঠে। একত্রিশবার লালকেল্লার উদ্যানে নিঝুম দেওদারের পাতার আড়ালে বিশ্রামবিলাসী পাখির দল ডানা ঝাপ্‌টিয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

আর, শেষ তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে নয়াদিল্লীর মধ্য-এশিয়া যাদুঘরের কটকের পাশে তন্দ্রাচ্ছন্ন একটি অদ্ভুত মূর্তির মানুষ হঠাৎ চমকে চোখ মেলে তাকায়। রাত্রিশেষের শেষ অন্ধকারের মধ্যে ঠিক এইখানে এসে সে বসেছিল, এখনও বসে আছে।

লোকটি খুবই বৃদ্ধ। গায়ের রং গৌর ছিল বলেই মনে হয়, কিন্তু এখন তামাটে হয়ে গেছে। বোধহয়, বহু বৎসরের মধ্যাহ্ন সূর্যের জ্বালা এই বৃদ্ধের দেহকে এত প্রচণ্ডভাবে বিবর্ণ করে তুলেছে। মাথাভরা পাকা চুলের বোঝা, সুতরাং মাথার গড়নটা ঠাহর হয় না, সাদা ভুরু দুটো অবসন্নভাবে ঝুলে পড়েছে, চোখের তারায় একটা ঘোলাটে ছায়া, কার দিকে তাকিয়ে আছে বোঝা যায় না। যেন, বহু দূর ব্যবধান থেকে দাঁড়িয়ে সমস্ত পৃথিবীর সকলের দিকেই এই বৃদ্ধ তাকিয়ে আছে। মাত্র একটা জীর্ণ শীর্ণ কম্বল তার পরিচ্ছদ, এমনভাবে গায়ে জড়িয়ে আছে যার মধ্যে কোন দেশী বা বিদেশী রীতি নেই। লোকটার চেহারা এতই রিক্ত, এতই নিঃস্ব ও এতই দরিদ্র যে দেখা মাত্র কেউ বলে দিতে পারবে না কোন্ দেশের লোক।

তবুও লোকটা যে ভারতবাসী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এবং মোটামুটি কেমন একটু অভারতীয় বলে ধারণা হয়। যার গায়ে কোন সংস্কৃতির ছাপই নেই, তার জাতি-কুলমান ধারণা করা কঠিন বৈকি!

সংস্কৃতিহীন এই রহস্যময় বৃদ্ধ একটি উপকথার পিতামহের মত যেন কিসের অপেক্ষায় বসে আছে। তার হাতে পোড়ামাটির তৈরী চৌক ঝাঁপির মত গঠনের একটা পাত্র, পাত্রের ভেতরে কি আছে তা সেই জানে। পাত্রের গায়ে কয়েকটা সাঙ্কেতিক চিহ্ন—গমের শীষের মত একটা অক্ষর, তার পাশে শাবলের ফলার মত একটা অক্ষর, তার পাশে সাপের কুণ্ডলীর মত আর একটা চিহ্ন।

এশিয়া যাদুঘরের সুরম্য অট্টালিকার সিঁড়িতে একটা কলরব শোনা যায়। বৃদ্ধ একটু ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বহু বিচিত্র পরিচ্ছদে শোভিত, সুন্দর ও সুশ্রী নরনারীর একটি জনতা মিউজিয়াম কক্ষের অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে বাইরে যাবার জন্য সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে। এশিয়া মহাদেশের, এমন কি মিশর প্রভৃতি নিকট প্রাচ্যের সমস্ত রাষ্ট্র ও দেশের লোক এই জনতার

মধ্যে আছে। সুধী, মনস্বী ও রুচিমান—জ্ঞানী, গুণী ও গবেষক—পণ্ডিত শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক সকলেই আছে। একটি সুশোভন সংস্কৃতিপরায়ণ জনতা।

জনতা ধীরে ধীরে ফটক পর্যন্ত এগিয়ে এল। রহস্যময় বৃদ্ধ হঠাৎ উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়ায়। এক হাতে পোড়া মাটির পাত্রটি তুলে ধরে, জনতাকে উদ্দেশ্য করে গম্ভীরভাবে ডাক দেয়—থামুন। জনতা বিস্মিত হয়ে থমকে দাঁড়ায়।

বৃদ্ধ—এই আমার উপহার, কে নিতে চান বলুন ?

বৃদ্ধের ভাষার মধ্যে কেমন একটা রূঢ়তা ছিল। জনতা বিস্মিত হলেও উৎসাহিত হলো না। তবু জনতার মধ্যে মাত্র একজন বৃদ্ধের দিকে একটু কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এলেন। এঁর নাম জামশিয়েদ বুখারী, ইরাণের শিল্পী।

জামশিয়েদ বুখারী—উপহার চেয়ে নিতে হবে, এ কেমন অদ্ভুত কথা ? আপনার ইচ্ছে হয়, উপহার দিয়ে দেবেন, চাই বা না চাই।

বৃদ্ধ—আমি যোগ্য লোকের হাতেই এই উপহার দিতে চাই।

জামশিয়েদ বুখারী হেসে ফেললেন—আমরা কি আপনার কাছে যোগ্যতার পরীক্ষা দেব ?

বৃদ্ধ—আমার গায়ে কোন সংস্কৃতির ছাপ নেই, কিন্তু সেজন্য তুচ্ছ করবেন না। আমি যা-ই হই, আমার এই উপহারের জিনিসটির মূল্য কম নয়।

বুখারী—তার মানে ?

বৃদ্ধ—আপনার হাতের ঐ গজদন্তের তৈরী সিগারেট কেসের চেয়ে এর দাম অনেক বেশী।

বুখারী বিরক্ত হয়ে ওঠেন—তার মানে ?

বৃদ্ধ—এটা একটা ঐতিহাসিক নিদর্শন।

এশিয়ার সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদের মধ্যে একটা কৌতূহলের সাড়া জেগে ওঠে। সকলে বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে আসে।

বৃদ্ধ এইবার একটু গর্বিতভাবেই বলে—এই মাটির পাত্রকে মাটি খুঁড়ে বের করেছি।

দেখি দেখি দেখি—জনতার সকলেই আগ্রহের সঙ্গে হাত তুলে মাটির পাত্রটা দেখবার জন্ম অনুরোধ করতে থাকে। প্যালেস্টাইনের নৃতত্ত্বের অধ্যাপক জ্যাকব বেন এজরা একটু বেশী ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

বেন এজরা—আচ্ছা, জিনিষটা মাটির নীচে কত ফুট গভীরে পেয়েছেন?

বৃদ্ধ—বাইশ ফুটেরও বেশী।

বেন এজরা—শুধু, মাটি খুঁড়তেই হয়েছে?

বৃদ্ধ—না। এক স্তর মাটি, তারপর এক স্তর বালু, তারপর চূর্ণপাথরের একটা স্তর, তারপর একটা নরম শ্লেটের স্তরের ওপর এই জিনিসটি পড়েছিল।

বেন এজরার দুই চক্ষুর দৃষ্টি পুলকাপ্লুত হয়ে ওঠে।

বেন এজরা অনুরোধ করে—ওটা আমাকে দিন, আমি ওর মূল্য বুঝতে পেরেছি।

বৃদ্ধ—কি বুঝতে পেরেছেন?

বেন এজরা—ওটা কম করেও খৃষ্টপূর্ব সাত হাজার বছর আগেকার সভ্যতার নিদর্শন।

বৃদ্ধ হেসে ফেলে—শান্ত হন, ব্যস্ত হবেন না। আমার প্রশ্নের উত্তর যিনি দিতে পারবেন, তাঁকেই এই উপহার দেব।

বুখারীও এবার ব্যস্ত হয়ে ওঠে—প্রশ্ন করুন, কি আপনার প্রশ্ন?

বেন এজরা—জিজ্ঞাসা করুন, আমরা উত্তর দেব।

বৃদ্ধ—আমার বিশ্বাস, এশিয়াকে যিনি ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছেন, তিনিই এশিয়াকে মহৎ করবার পথও চিনতে পেরেছেন।

আরব ঐতিহাসিক রফিক বে খুসী হয়ে বলেন—আমারও তাই বিশ্বাস।

বৃদ্ধ—আমার আর একটা বিশ্বাস, যিনি এশিয়াকে বুঝতে পেরেছেন, তিনিই বলে দিতে পারবেন এই পাত্রের ভেতর কি আছে? বলুন, কে বলতে পারেন? বলুন, বলুন।

বৃদ্ধের বিহ্বল আবেদনে জনতাও চঞ্চল হয়ে ওঠে। প্রত্যেকে উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত হয়।

প্রথম এগিয়ে আসেন কাজাকিস্তানের ভূতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক রুশ্‌ত্‌ বাহেরাম।

রুশ্‌ত্‌ বাহেরাম—আমি এশিয়াকে বুঝেছি, কারণ আমি তুষারমৌলী হিমালয়ের প্রতিটি পাষাণ-কণিকার ইতিহাস আজীবন অনুসন্ধান করেছি। এই হিমালয় এশিয়ার মাটিকে গড়েছে। সাইবেরিয়ার চিরতুহিন জীবন এই হিমালয়ের দান। হিমালয় প্রসন্ন হয়নি বলেই বিরাট গোবির বক্ষো-বিস্তৃত বালুকায় আগুনের জ্বালা জ্বলছে। ভারতের পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা এই হিমালয়েরই হৃদয়ের বিগলিত করুণার ধারা। ভল্‌গা, নীপার ও ইয়াংসিকিয়াং—এশিয়ার নদনদী ও হ্রদ আজও হিমালয়ের শাসনে যুগ যুগ ধরে চিহ্নিত পথে সলিলতীর্থ রচনা করে চলেছে। সম্রাট হিমালয়, বিরাট এশিয়া তাঁরই পাষাণের সাম্রাজ্য। একই গ্রানিটের কঠিন সূত্রে এশিয়ার সমগ্র উপত্যকার মৃণ্ময় শরীর নিবিড়ভাবে বাঁধা। কবে কোন্ দূর অতীতে, বিস্মরণের বাহিরে, টেথিস সমুদ্রের তরল সমাধি থেকে এক খণ্ড কঠিন পাষাণ নিজ পরমাণুর শক্তিতে উদ্গত হয়ে ধীরে ধীরে হিমালয়রূপে উঠে

দাঁড়িয়েছিল, গলিত বস্তুপুঞ্জের বৈচিত্র্যহীন শ্মশান থেকে, এশিয়া নামে এই ভূমিকে কোলে করে উঠে দাঁড়িয়েছিল হিমালয়। ককেসাসের উর্দ্ধত্যকা আর কাশ্মীরের উপত্যকায় যে সগোত্রতা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে অক্ষুণ্ণ হয়ে রয়েছে, তার ইতিহাস আমি জানি। প্রথম পল্লবযুগের প্রাণপঙ্কের আবির্ভাবকে, প্রথম আর্কীয় আগ্নেয় বিবরের উৎসারিত লাভাপুঞ্জকে, পার্মীয়, জুরাসিক ও ক্রিটেসীয় পুরাকল্পের পদার্থযজ্ঞের লক্ষ লক্ষ তুষারধৌত স্তরীভূত ও পুঞ্জীকৃত শিলা ধাতু ও লবণের শৈলমালাকে দিকে দিকে প্রসারিত করেছে এই হিমালয়। ভারতের গণ্ডোয়ানা ও ধারোয়ার সবল অস্থির মত এশিয়া ও আফ্রিকার কায়া রচনা করেছে। সমগ্র এশিয়ার এই শিলাময় ঐক্যের স্বরূপ আমি বুঝেছি।

বৃদ্ধ—বেশ, তাহ'লে বলুন, আমার এই ঐতিহাসিক পাত্রটির ভিতরে কি আছে ?

রুশ্‌তম্‌ বাহেরাম কিছুক্ষণ চিন্তিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর বলেন—এক টুকরো প্রাচীন অগ্নিশিলা।

বৃদ্ধ হেসে ফেলে—না, আপনি বলতে পারলেন না।

উত্তর দেবার জন্ম এগিয়ে আসেন নৃতাত্ত্বিক জ্যাকব বেন এজ্‌রা।

বেন এজ্‌রা—আমি এশিয়াকে বুঝেছি। আপনাকেও আমার খুবই চেনা-চেনা মনে হয়। আপনি ভারতের মানুষ, কিন্তু আপনার এই করোটীর গঠনে ও কপালের কুঞ্চিত ত্বকের রেখায় রেখায় এশিয়ার শোণিত-সমন্বয়ের ইতিহাস লেখা রয়েছে। আদি মানবের প্রসূতি ও ধাত্রী এই এশিয়াভূমি। আর্য ও ককেসীয়, প্রায়-অস্ট্রাল, মঙ্গোলীয়, ও নেগ্রিটো, ও আলপাইন, কত নরমূর্তির ছাঁচ এই এশিয়া গড়েছে, আবার মিলিয়ে মিশিয়ে মানুষের মূর্তিকে বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর করে তুলেছে। ফিলিপিন থেকে মাদাগাস্কার, মিশর হতে মহেঞ্জোদাড়ো, হুনান থেকে তেহারান, শ্রীনগর থেকে অনুরাধা-

পূর্ব—এশিয়ার মানুষ সর্বত্র একই মানুষ। ভারতের বাসরিকার চোখে ককেসাসের নীল নয়নের দ্যুতি, ককেসাসের অভিসারিকার নয়নে ভারতের কাজল চোখের চাহনি। ওষ্ঠে ও চিবুকে, ভুরু ও নাসিকায়, কেশে ও করোটীতে এশিয়ার মানুষ যুগব্যাপী বংশবিপ্লবের দান গ্রহণ করে এসেছে। আমি এশিয়ার মানুষ, আপনি এশিয়ার মানুষ। আমাদের শোণিতে একই ইতিহাসের উত্তাপ, তরলতা ও প্রবাহ। আমি এশিয়াকে এইভাবেই বুঝেছি। আমি জানি আপনার এই পোড়ামাটীর পাত্রে কি বস্তু আছে।

বৃদ্ধ—কি ?

বেন এজরা—ভারতে প্রথম আর্য অভিযাত্রীর করোটীর একটি ভগ্নাংশ।

বৃদ্ধ—না, বলতে পারলেন না।

উত্তর দেবার জন্য এগিয়ে আসেন কুমারী স্বরীতা, ইন্দোনেশিয়ার শিল্পী।

কুমারী স্বরীতা—আমি চিনেছি এশিয়াকে। এশিয়ার চিত্তের গভীরে যে ধ্যান, এশিয়ার কল্পনায় যে ঐশ্বর্য, এশিয়ার রুচিতে যে বর্ণময় বৈচিত্র্য, আমি তার রূপ উপলব্ধি করেছি। এশিয়ার প্রতিটি ব্রঞ্জ ও টেরাকোট্টা, দারুময় ধাতুময় ও শিলাময় ভাস্কর্যের বাণী আমি বুঝতে পারি। আমি জানি এলিফ্যাণ্টার ত্র্যম্বক সদাশিব সমগ্র এশিয়াকে সর্ব অকল্যাণের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্যে আজও জাগ্রত প্রহরীর মত দক্ষিণ সমুদ্রের দিগন্তে দৃষ্টি প্রসারিত করে রয়েছেন। নৃত্যপর নটরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি বলি—তুমি ভারতবর্ষ, তুমিই এশিয়া। জাপদ্বীপে অমিতাভ আছেন, চীনে অবলোকিতেশ্বর আছেন, বরবুদুরে বোধিসত্ত্বেরা অবিচল হয়ে আছেন। আংকর ভাটের বিষ্ণুর হাতে আজও অভয় মুদ্রা অক্ষুণ্ণ হয়ে আছে। কুশান গান্ধার আর হেলেনীয়, দ্রাবিড় আর ব্যাবিলনীয়—কত পদ্ধতি, কত রীতি ও কত অলঙ্কার এশিয়ার দেশে দেশে এক দেহে লীন হয়ে আছে। কত

ধ্যানী বুদ্ধ, কত গলিতজটা ত্রিনয়ন রুদ্র, কত গ্রোটেস্ক নরসিংহ ও ফিংক্স, কত উমা-মহেশ্বরের বিহ্বল দাম্পত্য, কত গণেশ-জননীর মাতৃত্ব মূর্তিতে মূর্তিতে রূপময় হয়ে আছে। আমি প্রজ্ঞাপারমিতার দেশের মেয়ে, হে বৃদ্ধ এশিয়া-মানব, আমার মুখের দিকে তাকাও। তাহলে বুঝতে পারবে, আমি মিথ্যে বলিনি।

বৃদ্ধ সস্নেহে কুমারী স্থরীতার দিকে তাকায়—হ্যাঁ, মিথ্যে বলনি। প্রজ্ঞাপারমিতার স্থস্মিত অধরের ঐশ্বর্য তুমি পেয়েছ। তরুণী এশিয়া! তুমি এশিয়ার রূপশিল্পের মহিমা বুঝতে পেরেছ।

কুমারী স্থরীতা—আমি শিল্পী বলেই এশিয়ার রূপের ঐক্য বুঝতে পেরেছি।

বৃদ্ধ—বল এই পাত্রে কি আছে?

কুমারী স্থরীতা—গুপ্তযুগের কোন স্তূপপীঠের প্রাচীরালগ্ন একটি ক্ষুদ্র পুত্তলিকা।

বৃদ্ধ—না।

কুমারী স্থরীতা—তবে চালুক্য যুগের কোন দেবদাসীর পদস্খলিত একটি নূপুর।

বৃদ্ধ—না।

মিশরের বৈজ্ঞানিক অল্ এদিল পাশা, উত্তর দেবার জন্য এগিয়ে আসেন।

এদিল পাশা—আমি এশিয়াকে বুঝেছি। আমি মিশরবাসী, তবু, আমি নিজেকে এশিয়ার আত্মীয় বলেই মনে করি। আমার দেশের পিরামিড আমার অহঙ্কার, কিন্তু এশিয়াবাসীরও অহঙ্কার। সমগ্র এশিয়ার প্রস্তর যুগের মনোলিথ সংস্কৃতি ও আমার দেশের পিরামিডের সাধনা একই প্রেরণার ইতিহাসে। সমগ্র এশিয়ার মানুষ বৃহৎ শিলার বেদিকা রচনা করে যে সভ্যতার আরাধনা করেছিল, আমন রা ও তুতেনখামেন তারই

মহিমাকে চরম করে তুলেছিলেন। ফ্যারোয়া মহিষীর গলায় একদিন নর্মদাভূমির কাঁচের মালা প্রীতির পুলকে দুলে উঠতো। সে কথা যাক্, আমি বিশ্বাস করি, সমগ্র এশিয়া বিজ্ঞানের আত্মীয়তায় একদিন এক হয়েছিল। এশিয়ার সেই জ্ঞানময় ঐক্যকে আমি উপলব্ধি করি। ভারতবর্ষ এশিয়াকে দশমিক শূন্য ও ইস্পাতের ফরমূলা উপহার দিয়েছে, ইরাণ এশিয়াকে বাস্তুবিজ্ঞান দিয়েছে, চীন এশিয়াকে কারুবিজ্ঞান দিয়েছে, আরব এশিয়াকে নৌবিদ্যা দিয়েছে। এই ভারতের তক্ষশিলা এশিয়ার জ্ঞানতীর্থ। জ্ঞানের বিনিময়ে, বিজ্ঞানীর দৌত্যে এশিয়ার সমগ্র দেশ সাংস্কৃতিক ঐক্য অর্জন করেছিল। আমি এশিয়ার এই জ্ঞানময় ঐক্য বুঝেছি।

বৃদ্ধ—বলুন, আমার এই অতি-পুরাতন ঐতিহাসিক মৃৎপাত্রের ভেতরে কি আছে?

এমিল পাশা—উজ্জয়িনীর মানমন্দিরের একটি দিগ্‌যন্ত্রের কাঁটা।

বৃদ্ধ—না।

আরব ঐতিহাসিক রফিক বে—আমি এশিয়াকে চিনি। আজ নয়, দশহাজার বছর আগে থেকে এশিয়ার মানুষ পণ্য বিনিময়ের সাধনায় ও ব্যবসায়ের সূত্রে যুক্ত হয়ে আছে। আমি কল্পনায় দেখতে পাই, মহেঞ্জোদাড়োর বণিকের দল পণ্যসম্ভার নিয়ে কত গিরিকান্তার পার হয়ে স্থলপথে হেঁটে চলেছে, মরুদ্যানে বিশ্রাম গ্রহণ করছে। উর কিশ ব্যাবিলন পার হয়ে তারা হেঁটে চলেছে। নীল নদের উপকূল ধরে তারা আরও উত্তরে হেঁটে চলেছে। আমি কল্পনা করতে পারি, চীনের সার্থবাহ চীনাংশুকের সম্ভার নিয়ে খোটান সমরকন্দ খিবা বোখারা পার হয়ে এশিয়ার বাজারে বাজারে ব্যবসায় করে ফিরে যাচ্ছে। তাম্রলিপ্ত ও সিংহশ্রীর বন্দরে এশিয়ার সমুদ্রচারী পণ্য-তরীর যে ভীড় আমার পূর্বপুরুষ দেখেছিল, আমার স্মরণের পটে সে ছবি স্বপ্নের মত আঁকা আছে।

বাণিজ্যের যোগাযোগে নিখিল এশিয়া একদিন যুক্ত ছিল। আমার বিশ্বাস, আপনার এই ঐতিহাসিক মৃৎপাত্রে একটি প্রাচীন মুদ্রা আছে।

বৃদ্ধ—না।

ইন্দোচীনের ভাষাতাত্ত্বিক ডক্টর তিন্‌চুয়ান্‌ উত্তর দেবার চেষ্টা করেন।

তিন্‌ চুয়ান্‌—আমি এশিয়াকে বুঝেছি, ভাষার বন্ধনে সমগ্র এশিয়া যুক্ত হয়ে আছে। এশিয়ার ভাষার ইতিহাসও একটা প্লাবনের ইতিহাসের মত। এশিয়ার মানুষ যে দেশেরই হউক, আমি যেন একই কণ্ঠস্বরের সুর শুনতে পাই। এই মানবতীর্থ ভারতেরই প্রতি জনপদে সমগ্র এশিয়ারই ভাষাস্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছে। আর্য ও মঙ্গোলীয়, মন্‌খমের ও ফিনো-উগ্রীয়—এশিয়ার সকল দেশের ভাষা তার ধ্বনি সমাস ও ব্যঞ্জনা নিয়ে কোটি কোটি মানুষের মুখে নিত্যদিন উচ্চারিত হয়ে চলেছে। ভাষার বন্ধনে এশিয়ার সকল দেশের হৃদয় এক হয়ে বাঁধা। আমি এশিয়ার এই ঐক্য মনেপ্রাণে বুঝতে পারি। আমার বিশ্বাস, আপনার এই পাত্রের মধ্যে আকিমীয় বা খরোষ্ঠি অক্ষরে লিখিত একটি তাম্রশাসন আছে।

বৃদ্ধ—না।

কেউ উত্তর দিতে পারে না। সকলের মুখে একটা বিষণ্ণতার ভাব দেখা দেয়। কী এমন প্রচণ্ড মূল্যবান বস্তু আছে এই রহস্যময় বৃদ্ধের মৃৎপাত্রের ভেতরে? কিন্তু বৃদ্ধের মুখে আগের চেয়ে একটু উৎফুল্লতার চিহ্ন ফুটে ওঠে। বৃদ্ধ যেন নিজেই অনুতপ্ত হয়ে সৌজন্যের সুরে বলে—আপনারা কেউ বলতে পারলেন না, তার জন্যে আমি দুঃখিত। এই উপহার আমি কাউকে দিয়ে দিতে পারলেই খুশি হ'তাম। কারণ এটা আমার কাছে একটা ভয়ানক বোঝার মত হয়ে আছে। বিশ্বাস ক'রে কারও হাতে এর ভার দিয়ে দিতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।

বুখারী একটু বিরক্ত হয়—এত কথা বলবার পরেও কি আপনার মনে এই ধারণা রয়ে গেল যে আমরা এশিয়াকে বুঝিনি ?

বৃদ্ধ—হ্যাঁ বোঝেন নি।

বৃদ্ধ যেন একটু উদ্ধতভাবেই প্রত্যুত্তর দেয়। এশিয়ার সাংস্কৃতিক অতিথির দল অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। কুমারী সুরীতা চিরকালের অভিমানিনী এশিয়া-দুহিতার মতই ভ্রূভঙ্গী করে।

কুমারী সুরীতা—তাহ'লে আজ পর্যন্ত কেউ এশিয়াকে বোঝেনি, আর আপনার এই মৃৎপাত্রের মধ্যেও কিছু নেই।

বৃদ্ধ—রাগ করো না। আমি বিশ্বাস করি এশিয়ার সংস্কৃতির গৌরব তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ, এশিয়ার সাংস্কৃতিক ঐক্যের সত্যকেও তোমরা চিনতে পেরেছ, এ বড় কম কথা নয়।

বেন এজ্‌রা—তবে আপনার আপত্তির কারণটা কি ?

বৃদ্ধ—আপনারা এশিয়াকে বোঝেন নি, বুঝলে এশিয়ার সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে পারতেন।

এদিল পাশা—আবার সেই কথা !

বৃদ্ধের শান্ত মুখের লোল মাংসপেশীগুলি হঠাৎ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে—হ্যাঁ, সেই একই কথা। অহংকার করবেন না। কোথায় আপনার এশিয়ার সংস্কৃতি ?

জামশিয়েদ বুখারী—ওমরখৈয়ামের রুবাইয়ে, তানসেনের গানে, আগ্রার তাজমহলে, তাঞ্জোরের মন্দিরে, দামাস্কার গোলাপে, ভারতের মসলিনে, যবদ্বীপের নৃত্যে.........

বৃদ্ধ—থামুন। বাজে কথা বলবেন না। আমার দিকে তাকান।

সকলে সন্ত্রস্তভাবে রহস্যময় বৃদ্ধের বিক্ষুব্ধ মূর্তির দিকে তাকায়।

বৃদ্ধ—কোথায় আমার গান ? আমার কবিতাই বা কোথায় ? কে করে

আমাকে নাচ শিখিয়েছে ? আমার বাগিচাও নেই, গোলাপও নেই। তাঞ্জোরের মন্দিরে আমাকে কে কবে ঢুকতে দেখেছে ? আমি কবে মসলিনের পরিচ্ছদ গায়ে দিয়েছি ? আপনাদের সংস্কৃতি আমাকে দিতে পেরেছেন কি ? কিন্তু আমিও তো আপনাদেরই মত এশিয়ার মানুষ।

সংস্কৃতিপরায়ণ মনস্বীদের জনতা হঠাৎ একটা মূর্খের ভীড়ের মত নিরুত্তর হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। দেখে মনে হয় এই রূঢ় প্রশ্নটা তাদের আত্মপ্রসন্ন বিদ্যা ও অহমিকার ওপর আকস্মিক আঘাতের মত এসে পড়েছে।

বৃদ্ধের চোখের দৃষ্টিটা কিন্তু প্রিয় পিতামহের মত মুহূর্ত্তের মধ্যেই স্নেহার্দ্র হয়ে ওঠে।

বৃদ্ধ—একটা কথা বলি শুনুন। সত্যিই যদি আপনারা এশিয়াকে বুঝতেন, তবে এশিয়ার সংস্কৃতি রক্ষার জন্যও চেষ্টা করতেন।

রফিক বে, বেন্ এজ্রা, রুশত্ বাহেরাম, জামশিয়েদ বুখারী, কুমারী স্বরীতা, এদিল পাশা ও ডক্টর তিন্ চুয়ান্ সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে—আমরা চেষ্টা করছি। বিশ্বাস না হয়……।

বৃদ্ধ—কি চেষ্টা করছেন ?

কুমারী স্বরীতা—আমাদের সঙ্গে আসুন, স্বচক্ষে দেখবেন।

বৃদ্ধ—চল, আমিও নিশ্চিন্ত হই, আর এই বোঝা বইতে পারছি না।

বৃদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে এশিয়ার অতিথিদল রওনা হয়।

(২)

পুরানা কেল্লার বড় দরওয়াজা পার হয়ে জনতা প্রাচীন সেরশাহী দিল্লীর আঙিনায় প্রবেশ করে। নিকটে সেরশাহের মসজিদ শতাব্দীর সাক্ষীর মত দাঁড়িয়ে আছে। নূতন মণ্ডপ তৈরী হয়েছে, তারই অভ্যন্তরে

প্রথম এশিয়া সম্মেলন। শত শত অভ্যাগত ও প্রতিনিধি এবং হাজার হাজার দর্শক।

সম্মেলন মণ্ডপের প্রবেশপথে জনতা এগিয়ে যেতেই স্বেচ্ছাসেবকেরা সরে দাঁড়ায়। সকলে একে একে ভেতরে প্রবেশ করে। বৃদ্ধ ভেতরে যাবার জন্য এগিয়ে যেতেই স্বেচ্ছাসেবক বাধা দেয়—আপনি বাইরে থাকুন।

বৃদ্ধ—কেন?

স্বেচ্ছাসেবক—আপনি প্রতিনিধি নন, দর্শকও নন, আপনার কোন টিকিট নেই।

বৃদ্ধ—সত্যি কথা, আমার কিছুই নেই। কিন্তু আমি এশিয়া সম্মেলনের জন্য একটা উপহার নিয়ে এসেছি।

স্বেচ্ছাসেবক—প্রদর্শনীর ম্যানেজারের কাছে নিয়ে যান।

বৃদ্ধ হেসে ফেলে। ফিরে যাবার জন্য আবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কুমারী স্বরীতা, জামশিয়েদ, বেন্ এজরা সবাই আবার মণ্ডপের ভেতর থেকে ব্যস্তভাবে বাইরে ছুটে আসে।

কুমারী স্বরীতা এসে বৃদ্ধের হাত চেপে ধরে—চলে যাবেন না।

বৃদ্ধ—আমি প্রতিনিধি নই।

স্বরীতার মুখ করুণ হয়ে ওঠে—বুঝেছি, কিন্তু একটু দাঁড়ান। অভ্যর্থনা সমিতির কেউ আসলে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

বেন্ এজরা—আপনি ক্ষুণ্ণ হবেন না। আপনাকে বুঝতে পারছে না বলেই বাধা দিচ্ছে। ভারতীয় প্রতিনিধিরা এসে সবকথা শুনলেই একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

মণ্ডপের প্রবেশপথে ভীড় ক্রমেই বাড়তে থাকে। বহু প্রতিনিধি, দর্শক ও অভ্যাগত কৌতূহলী হয়ে বৃদ্ধের চারদিকে একটা ব্যূহ রচনা

করে দাঁড়ায়। ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতাত্ত্বিক সার্ভে বিভাগের জনৈক বলিষ্ঠ গবেষক ভীড় ঠেলে একেবারে বৃদ্ধের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়।

বলিষ্ঠ গবেষক—আপনি কি একটা উপহার নিয়ে এসেছেন শুনলাম। দেখি?

বৃদ্ধ পোড়ামাটির প'ত্রটি দেখায়—এই যে।

বলিষ্ঠ গবেষক—ওটা আবার কি?

বৃদ্ধ—একটা ঐতিহাসিক নিদর্শন।

বলিষ্ঠ গবেষক—কোথায় পেয়েছেন?

বৃদ্ধ—ঝেলাম নদীর ধারে, ভেড়ীওয়ালাদের গ্রামে, একটা স্তূপ খনন করে, বাইশ ফুট গভীরে।

বলিষ্ঠ গবেষক—ওটা আমাকে দিয়ে দিন।

বৃদ্ধ—কেন?

বলিষ্ঠ গবেষক—এশিয়ার সংস্কৃতির একটা মূল্যবান নিদর্শন বলে মনে হচ্ছে।

বৃদ্ধ—কিন্তু আপনাকে দেব কেন?

বলিষ্ঠ গবেষক—কিন্তু আপনি ওটা কাছে রেখে কি করবেন? এশিয়ার সংস্কৃতির কি বোঝেন আপনি?

বৃদ্ধের নিষ্প্রভ চোখ দুটো দপ্ করে জ্বলে ওঠে।

বৃদ্ধ—হ্যাঁ মহাশয়, আমি এশিয়ার সংস্কৃতির কিছুই বুঝি না। কিন্তু আমি না হলে এশিয়ার সব রঙের আলপনা একদিনে মুছে যেত, সব সুর স্তব্ধ হয়ে যেত, সব শিখর, আমলক, মিনার ও গম্বুজ ধুলোয় লুটিয়ে পড়তো। আমি পাথর ভেঙে পথ না করে দিলে এশিয়ার শোভাযাত্রার গতি রুদ্ধ হয়ে যেত। মার্কো পোলো ও মেগাস্থিনিসের দৌত্য আর হুয়ান সাঙের পরিব্রজ্যা অলীক হয়ে থাকতো

বলিষ্ঠ গবেষক—আপনি দেখছি বেতালের মত কথা বলছেন। কে আপনি ?

বৃদ্ধ—আমার স্বেদ শোণিত আর নিঃশ্বাস দিয়ে আমি সংস্কৃতির রথ টানি। লক্ষ সংঘারামের জন্য মাটি কাটি, পিরামিডের জন্যে পাথর ভাঙি আর ফতেপুর সিক্রীর স্বপ্নভবন খোয়াবগাহের জন্য রত্নশিলার বোঝা বহন করে আনি। আমি সমুদ্রগুপ্তের সিংহাসন মাথায় বহন করে যোজন পথ পার হয়ে মধ্যএশিয়ায় নিয়ে গেছি। বণিকের পণ্যের বোঝা আমারই মেরুদণ্ডের জোরে বহন করে আমিই নিয়ে গেছি অতীত মেসপটেমিয়ায়। কত চেঙ্গিসের হিংসার সেবায় আমিই সৈনিকরূপে প্রাণ উৎসর্গ করেছি, এশিয়ার প্রতি খর্জুরকুঞ্জে আজও আমার অস্থি ছড়িয়ে আছে। আমি চিরকালের ডুবুরি, সমুদ্রে ডুব দিয়ে শুক্তি কুড়াই, নিজে উলঙ্গ হয়েই রয়ে গেছি আর আপনার সংস্কৃতির গলায় দোলে মুক্তার মালা।

বলিষ্ঠ গবেষক—আপনি শুধু একদিক দেখছেন। এশিয়ার সংস্কৃতি, অর্থাৎ ভগবান তথাগতের পঞ্চশীল ও মহাকরুণা, কনফুসিয়াসের নীতি, জরথুস্ত্রের গাথা·········।

বৃদ্ধ গর্জ্জন করে ওঠে—চুপ! তাঁদের বাণীকে আপনারা চিরকাল অগ্রাহ্য করেছেন, আর চিরকাল তাদের নামের দোহাই দিয়ে এসেছেন। আমাকে বাদ দিয়ে শুধু আপনাকে সভ্য হবার জন্য বুদ্ধ ও কনফুসিয়াস দিব্যি দিয়েছিলেন ?

বলিষ্ঠ গবেষক—না।

বৃদ্ধ—তবে আমার এ দশা কেন ?

বলিষ্ঠ গবেষক—আমি কি জানি ? এশিয়া সম্মেলনকে জিজ্ঞেস করুন।

বলিষ্ঠ গবেষক যেমন হন্তদন্ত হয়ে এসেছিল, তেমনি হন্তদন্ত হয়ে চলে যায়।

সম্মেলনের লগ্ন ঘনিয়ে আসছে। কর্মীদের ছুটাছুটি উদ্দাম হয়ে ওঠে। বাইরের দিকে আর একটা নতুন হর্ষ শোনা যায়, হেমন্তের গঙ্গার মৃদু তরঙ্গরোলের মত, মহীশূরের চন্দন বনে প্রথম দক্ষিণসমীরের উল্লাসের মত, দূর আরতির বাদ্যের মত সুললিত ও শ্রুতিমধুর। ভারতীয় প্রতিনিধির দল আসছেন। তাঁদের চোখের দৃষ্টি নতুন প্রদীপের আলোকের মত দ্যুতিময়, তাঁদের ওষ্ঠে মীরপুর খাসের ব্রহ্মার স্মিত গাম্ভীর্য্য আবার যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁদের গ্রীবার ভঙ্গীতে, তাঁদের গতিতে, তাঁদের দুই বাহুর আন্দোলনে আজও যেন ক্ষমা, করুণা ও অবন্তী মুদ্রা অস্পষ্টভাবে মিশে আছে। কুমারজীব, জিনগুপ্ত, বুদ্ধভদ্র, দীপঙ্কর ও ধীমানের প্রতিচ্ছায়ার মিছিলের মত ভারতের সুধীবৃন্দ আসছেন।

সম্মেলনের প্রবেশপথে এসে মিছিল হঠাৎ থেমে যায়। রহস্যময় বৃদ্ধ তার *ঐতিহাসিক নিদর্শন* পোড়ামাটির পাত্রটি দু'হাত দিয়ে ঊর্ধ্বে তুলে হাঁক দেয়—আমার উপহার।

এশিয়া যাদুঘরের অধ্যক্ষ সৌম্যমূর্ত্তি প্রবীণ জ্ঞানী ডক্টর অভয়ঙ্কর বৃদ্ধের মৃৎপাত্রটির দিকে গভীর দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসেন, বৃদ্ধকে প্রশ্ন করেন। জনতা একটা বিরাট নাটকের কুশীলবের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

ডক্টর অভয়ঙ্কর—দেখি, জিনিসটা আমার চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

বৃদ্ধ ক্ষণিকের মত চমকে ওঠে। ডক্টর অভয়ঙ্করের মুখের দিকে ভয়ার্ত্তভাবে তাকিয়ে থাকে।

ডক্টর অভয়ঙ্কর মৃৎপাত্রের গায়ে চিহ্নিত অক্ষরগুলির ওপর হাত বুলিয়ে যেন একটা ঐতিহাসিক রহস্যের ঘুম ভাঙাতে থাকেন। তারপর তৃপ্তভাবে বলেন—হাঁ, বুঝতে পেরেছি।

বৃদ্ধ বিবর্ণমুখে ত্রাসকম্পিত স্বরে যেন আক্ষেপ করে ওঠে—আপনি জানেন, এর ভেতর কি আছে ?

ডক্টর অভয়ঙ্কর—জানি। পাত্রের ঢাকা তুলে ফেলুন।

বৃদ্ধ দু'হাত দিয়ে পাত্রটাকে চেপে ধরে। —না, না, না। আপনার বিদ্যার জোরে আমার উপহার কেড়ে নেবেন না।

ডক্টর অভয়ঙ্কর—আমি কথা দিচ্ছি, কেউ কাড়বে না। আপনার যাকে ইচ্ছে হয় উপহার দিয়ে যাবেন।

বৃদ্ধের হাত ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে। ধীরে ধীরে মৃৎপাত্রের ঢাকা তুলে নেয়। সমস্ত জনতার দৃষ্টি একমুখী হয়ে দেখতে থাকে, পাত্রের ভেতর ধূসরবর্ণের কি একটা চূর্ণ বস্তু পড়ে রয়েছে।

ভস্ম! একমুঠো ভস্ম! জনতা হতভম্বের মত তাকিয়ে থাকে। ডক্টর অভয়ঙ্কর তাঁর চশমা মুছে নিয়ে আবার চোখে পরেন।

ডক্টর অভয়ঙ্কর—হ্যাঁ, এই ভস্ম কোন আগ্নেয়গিরির ভস্ম নয়। এশিয়ার কোন এক প্রাচীন ক্রীতদাসের অস্থিভস্ম।

ডাঃ তিন্ চুয়ান্—কোন্ যুগের ?

ডক্টর অভয়ঙ্কর—আর্য যুগের হতে পারে, প্রাগার্যও হতে পারে। অতীতে এই ধরণের একটা লোকাচার ছিল। প্রবাসে কোন ক্রীতদাসের মৃত্যু হলে, তার অস্থিভস্ম মাটির আধারে প্রিয়-পরিজনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। আমি বেলুচিস্তানে ও সিস্তালিকের কয়েকটা জায়গায় ঢিবি খুঁড়ে এই ধরণের আরও কতগুলি ভস্মাধারের ভাঙা ভাঙা অংশ পেয়েছি, কিন্তু এরকম আস্ত একটা নিদর্শন এই প্রথম দেখলাম। যাক্, সম্মেলনের সময় হয়ে এসেছে, সবাই চলুন।

কুমারী সুরীতা—এই বৃদ্ধকেও ভেতরে যাবার অনুমতি দিন।

ডক্টর অভয়ঙ্কর—কেন ?

কুমারী সুরীতা—ইনি সম্মেলনকে এই মৃৎপাত্রটি উপহার দিতে চান।

ডক্টর অভয়ঙ্কর—বেশ তো, আমার হাতে দিন।

বৃদ্ধ—আমার দিতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু নিশ্চিন্ত না হলে······।

ডক্টর অভয়ঙ্কর—আপনার কিসের দুশ্চিন্তা?

বৃদ্ধ—আমার কতগুলো ধারণা আছে, সেগুলো পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত······।

ডক্টর অভয়ঙ্কর—[illegible] বলুন।

বৃদ্ধ—আমার ধারণা এশিয়াকে যাঁরা ঠিক ঠিক বুঝেছেন, তাঁরাই এশিয়ার সংস্কৃতি রক্ষা করতে পারবেন। আমি তাঁদেরই হাতে এই উপহার দিতে চাই।

ডক্টর অভয়ঙ্কর—ভেতরে চলুন। আপনার ধারণা পরিষ্কার করে নিতে পারবেন।

সমস্ত জনতা সম্মেলন মণ্ডপের ভেতরে প্রবেশ করে।

(৩)

এশিয়া সম্মেলনের মণ্ডপ। এশিয়ার সমস্ত দেশের প্রতিনিধিবৃন্দের এক বিরাট পরিষদ। প্রতি রাষ্ট্রের পতাকা, কত বিচিত্র লাঞ্ছন, কত প্রতীক ও কত মূর্তির গ্যালারি। কত চিত্র ও রঞ্জিত চীনাংশুক। সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে, প্রদর্শনীর পুঞ্জে পুঞ্জে সজ্জীকৃত নিদর্শনের সম্ভারের দিকে তাকিয়ে রহস্যময় বৃদ্ধ মণ্ডপের ভেতর ঘুরতে থাকে। ধীরে ধীরে বৃদ্ধের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসে, নিজেকে বড় বেশি অসহায় মনে হয়। যেন একটা অনাহূত অপয়া আবির্ভাবের মত সে এই গৌরবের মেলায় এসে জোর করে ঢুকেছে।

সম্মেলন আরম্ভ হবে। সভাতল গম্ভীর হয়ে আসে, বৃদ্ধ হঠাৎ

ব্যস্তভাবে মণ্ডপের দরজার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। কুমারী স্বরীতা ব্যস্তভাবে এসে বৃদ্ধকে অনুনয় করে।

স্বরীতা—আপনি আবার চলে যাচ্ছেন?

বৃদ্ধ—হ্যাঁ।

স্বরীতা—কেন?

বৃদ্ধ—এ জায়গাটা মায়াপুরীর মত মনোহর। আমি কামনা করি তোমাদের চেষ্টা সফল হোক্। তোমাদের দিকে তাকিয়ে অনেকখানি আশা হচ্ছে, কিন্তু একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারছি না কন্যা। একবার ইচ্ছে হয়েছিল, এই সম্মেলনের হাতেই উপহার দিয়ে দিই, কিন্তু পারলাম না।

স্বরীতা—এশিয়ার এই ঐক্য দেখেও আপনি বিশ্বাস করলেন না?

বৃদ্ধ—এটা তোমাদের গৌরবের ঐক্য, সোনার শিকল দিয়ে বাঁধা। এরকম তো আগেও হয়েছিল, হয়েও আসছে। তবু এশিয়ার সংস্কৃতি যুগে যুগে বারবার ভেঙে গেছে। মর্মর স্তম্ভ আর স্বর্ণচূড়া সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে পারেনি।

স্বরীতা—কে পারে?

বৃদ্ধ—আমি পারি।

স্বরীতা—সত্যি করে বলুন তো আপনি কে?

বৃদ্ধ—এখনো চিনতে পারলে না? আমি এশিয়ার শূদ্র। আমাকে সংস্কৃতি দাও, তবেই সংস্কৃতি বাঁচবে। আমাকে সংস্কৃতি দাও তবে আর পৃথিবীতে চেঙ্গিসের অভ্যুত্থান সম্ভব হবে না। নইলে, হে এশিয়ার করুণারূপিনী কন্যা, বার বার দুর্যোগে ও অপমানে তোমাকে কাঁদতেই হবে, তোমার বীণা ভেঙে যাবে, আল্পনার রঙ মুছে যাবে। আমি চলি।

স্বরীতা—আপনার এই মৃৎ পাত্রটিকে কি করবেন?

বৃদ্ধ—আমার সঙ্গে আমারই সমাধিতে প্রোথিত হয়ে থাকবে।

সুরীতার চক্ষু সজল হয়ে ওঠে। বৃদ্ধ সান্ত্বনা দেয়।

বৃদ্ধ—দুঃখ করো না। এই ক্রীতদাসের অস্থিভস্ম, আমারই পূর্ব পুরুষের আবেদন এর প্রতি রেণুতে নির্বাক হয়ে মিশে আছে। এরই মতন আমিও আজ এশিয়ার যাদুঘরের সামগ্রী হয়ে রয়েছি। এরা স্তব্ধ ও ভস্মীভূত, আমি সবাক্‌ ও চলমান। যাদুঘরের জীবন আর সইতে পারি না কন্যা।

বৃদ্ধ সম্মেলন-মণ্ডপের বহির্দ্বার পার হয়ে বাইরে চলে যায়। সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়।

(৪)

আবার পুরাণা কিল্লার বড় দরওয়াজা। একটি সবল অস্থিবহুল চেহারার যুবক একাকী বসেছিল, তার পাশে একটা কোদাল। যুবকটির পরিধানে গিরিমাটির রঙে ছোপান একটা শতছিন্ন ও মলিন পায়জামা। গায়ে কোন জামা নেই।

রহস্যময় বৃদ্ধ উপস্থিত হয়। সাদা ভুরু টান করে কপালের ওপর তুলে, চোখের দৃষ্টিটাকে যেন বাধামুক্ত করে বৃদ্ধ যুবকটির দিকে কৌতূহলী হয়ে তাকায়।

বৃদ্ধ—তুমি এখানে কি করছো?

যুবক—বসে আছি।

বৃদ্ধ—ওখানে এশিয়া সম্মেলন হচ্ছে, জান না?

যুবক—জানি বৈকি। আমিই তো এতদিন তার জন্য খেটেছি।

বৃদ্ধ—তুমি খেটেছ?

যুবক—হ্যাঁ, আমি সমস্ত জায়গাটার মাটি চৌরস করেছি, গর্ত খুঁড়েছি, রাবিশ সরিয়েছি—ডবল মজুরী পেয়েছি।

বৃদ্ধ—তুমি কুলি ?

যুবক—হ্যাঁ।

বৃদ্ধ—তবে আর এখানে বসে কেন ? তোমার কাজ তো ফুরিয়ে গেছে।

যুবক একটু ইতস্ততঃ করে বলে—আমি একজনের অপেক্ষায় বসে আছি। শুনেছি তিনি আসবেন। একবার তাঁকে দেখতে পারলেই আমার এশিয়া দেখা হয়ে যাবে।

বৃদ্ধ—তিনি কে ?

যুবক—গান্ধীজী।

বৃদ্ধ—তিনি এখন কোথায় ?

যুবক—পাটনাতে আছেন।

বৃদ্ধ—সেখানে কি করছেন ?

যুবক—শোনেন নি ? মানুষ মানুষকে খুন করছে, ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে, ধর্মস্থান ভেঙে চুরমার করছে। গান্ধীজী সেখানে আছেন, খুনীকে প্রায়শ্চিত্ত করাচ্ছেন, পীড়িতকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। মানুষের পোড়া ভিটায় আবার নূতন করে ঘর তুলে দিচ্ছেন।

বৃদ্ধ যেন দিগন্তের দিকে দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মুখ থেকে অর্ধস্ফুট স্বরে একটা কথা বার বার ধ্বনিত হতে থাকে—এশিয়ার মানুষ ! এশিয়ার মানুষ !

যুবকটি ভয় পায়। বিচলিতভাবে উঠে দাঁড়ায়। বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে—কি হলো ? আপনি কে ? এশিয়ার মানুষের কি হয়েছে ? আপনি অমন করে কি দেখছেন ?

বৃদ্ধ—দেখছি, এশিয়ার মানুষের আত্মাকে পাথর-চাপা সমাধি থেকে খুঁড়ে বের করছেন এক মহাশ্রমিক, তাঁরই নাম গান্ধী। শোন……।

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর হঠাৎ উল্লাসে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। কুলি যুবকটি আবার চম্‌কে ওঠে।

বৃদ্ধ—আমি এশিয়ার পথের মানুষ, নগণ্য নিরীহ ও সাধারণ। তোমারই মত। আমাকে সভ্যতার পুণ্য দিয়ে, সুন্দর করে যিনি তুলবেন তাঁরই নাম তুমি আমাকে শুনিয়েছ। তিনি আসছেন, তাঁর পদধ্বনির জন্য কান পেতে তুমি বসে আছ। আমার অনুরোধ—বসে থাক ভাই। আমার হয়ে এইখানে তুমি তাঁর জন্যে অপেক্ষা কর। যদি তিনি আসেন, তাঁর হাতে আমার প্রতিনিধি হয়ে তুমি এই উপহার তুলে দিও; আমাকে কথা দাও।

যুবক—আমি কথা দিচ্ছি।

বৃদ্ধ—আমি নিশ্চিন্ত।

যুবকটির হাতে মৃৎপাত্রটীকে দিয়ে রহস্যময় বৃদ্ধ চলে যায়। দিল্লীর অপরাহ্নের সূর্য্যালোকে হঠাৎ পথের ওপর একটা ধূলোর ঝড় ছটফট করে ওঠে। তারই মধ্যে ধূলো ও ছায়া হয়ে যেন বৃদ্ধ অদৃশ্য হয়ে যায়।

[ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতাত্ত্বিক সার্ভে বিভাগের একজন ক্যাম্প কুলি, তার নাম ছিল নাথুরাম। বহুবছর ধরে সার্ভেয়ারদের অধীনে সে মাটী খুঁড়েছে। মজুরী নিয়ে সে প্রায়ই গণ্ডগোল করতো। একদিন দেখা গেল ক্যাম্প মিউজিয়ামে চুরি হয়ে গেছে। নীলার মালা, তামার মূর্ত্তি, একটা সোনার দীপাধার—এত সব মূল্যবান নিদর্শন থাকতেও চোর শুধু একটা ছোট মৃৎপাত্র চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। নাথুরামকেও তারপর দিন আর ক্যাম্পে দেখা গেল না। আর তাকে কোথাও কখনো দেখা যায়নি। নাথুরাম বুড়ো হয়েছিল, কাজেই যেখানে চলে যাক না কেন, আজ পর্য্যন্ত সে বেঁচে থাকতে পারে না।]

মধুসংহিতা

ওঁ মধু! মধু! মধু!

মন্ত্রোচ্চারণ করছি না। নিছক পেটুকে আহ্বানে মধু নামে একটি খাদ্যবস্তুকেই অভিনন্দন জানাই। পৃথিবীর যাবতীয় খাদ্যের মধ্যে মধুর চেয়ে রোমান্টিক খাদ্য আর কি হতে পারে? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাসায়নিকের জ্ঞানের অহংকারকে খর্ব করে দিয়ে একটি ক্ষুদ্র পতঙ্গ আজও পৃথিবীর কুঞ্জে কাননে যে রসাল কীর্তি রচনা করে চলেছে, তারই দানের গুণে যুগ যুগ ধরে মানুষের গলা মিষ্টি হয়েছে। কবি সেক্সপীয়ারের কাছে আমাদের এই ক্ষুদ্র পতঙ্গটি শ্রদ্ধা আদায় করে ছেড়েছে

……So work the honey bees,
,Creatures that, by rule in nature, teach
The art of order to a peopled Kingdom.

মধুপ্রীত কবি ভার্জিল হুলায়ুধ মৌমাছিকে 'কালো আঙুর' ব'লে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন।

* * * * *

জীবনের সব আচরণে আমরা আন্তরিকভাবে মধুরতাকে কামনা করি। ওঁর স্বভাব মধুর, তাঁর দৃষ্টি মধুর, ছোট ছেলেটির হাসি কী মধুর! মানুষের জীবনের যত প্রাপ্য ও কাম্যের প্রকৃতিকে অজস্র ভাষা দিয়েও যখন বুঝিয়ে উঠতে পারি না, তখন একটি মাত্র উপমা দিয়ে তাহা প্রকাশ করে ফেলি—মধুর! সকল মনের মাধুরী মিশায়ে মানুষ একমাত্র তাকেই রচনা করতে চায়, জীবনের উর্ধলোকে যা অপ্রত্যক্ষের রহস্য হয়ে আছে। চরন্ ইব মধু বিন্দতি—যুগ যুগ ধরে আমরা যে এগিয়ে চলেছি তার প্রাপ্তি ও আনন্দ একমাত্র মধুর সঙ্গেই তুলনীয়।

মধু আমাদের জীবনের মাঙ্গলিক উপচারের মধ্যে একটি। রাজ অভিষেকের কাজে মধু চাই. শিশুর জাতকৃত্যে মধু চাই। কবি ভার্জিল মধুর বন্দনা করেছেন। মধু ও মধুপতঙ্গ আরিস্টটলের প্রিয় ছিল, মেটারলিঙ্ক জীবনের দর্শনকেই মধুময়রূপে দেখবার চেষ্টা করেছিলেন।

সারা পৃথিবীর আয়ুঃশাস্ত্রী পণ্ডিত ও চিকিৎসকের দল মুক্তকণ্ঠে মধুর মহিমাকে স্বীকার করে গেছেন। আয়ু কান্তি মেধা—জীবনের স্বরূপকে সুন্দর করার আয়োজনে মধুর চেয়ে মধুরতর কিছু আর হতে পারে না। আমাদের ভাষায় 'মধু' আজও নিরুপম হয়ে রয়েছে, মধুর সঙ্গে আমরা অন্যকে তুলনা করি, মধুকে কারও সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

* * * * *

মধুকে নিছক খাদ্য আখ্যা দিলে যেন এর গৌরবকে ছোট করা হয়। আধুনিক রাসায়নিকের লেবরেটরীতে হাজার টন নকল শর্করা তৈরী হতে পারে, কিন্তু 'মধু' হবে না। মানুষের বুদ্ধির চেয়ে একটি ছোট পতঙ্গের প্রবৃত্তি যে সূক্ষ্মতায় ও দক্ষতায় এখনো কত বেশী উন্নত হয়ে আছে, তার প্রমাণ এই মধু। দিনের আলো দেখা দিতে না দিতে এই কোটি কোটি পতঙ্গ-কেমিষ্টের ঘুম ভেঙ্গে যায়। চাক ছেড়ে উড়ে চলে যায় দূরে ও সুদূরে—বনে উপবনে। ডি-এস-সি ডিগ্রী নেই, তবুও ফুলের বুকে কোথায় তার মধুময় আত্মাটি লুকিয়ে আছে, তার সন্ধান বিনা মাইক্রোস্কোপে খুঁজে বার করে। নিরাস্বাদ জগত থেকে এক বিচিত্র স্বাদুতা আহরণ করে নিয়ে যায়। জড় ও জঙ্গমের জগতে এক গোপন পদার্থলীলাকে সে বন্দী করে, সুললিত করে, তাকে মধুতে পরিণত করে। মধুর মধ্যে তাই যেন মহাকাব্যের আস্বাদ আছে।

* * * * *

একটা আশঙ্কার বিষয়, আমাদের মধ্যে তবুও মধু সম্বন্ধে একটা

উদাসীনতা এসেছে। আগে ছিল না, এটা বর্তমানের লক্ষণ। এই লক্ষণটা যেন পরোক্ষভাবে আমাদের বর্তমান সাংস্কৃতিক দীনতাটুকু স্মরণ করিয়ে দেয়। মধুকে খাদ্য হিসাবেও আহ্বান করতে আমরা আজ ভুলে গেছি। স্যাকারিন-উপাসনার যুগে আমাদের এ ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু এ ভুল বড় ভয়ানক ভুল। মধু কাল্চার ঠিক ঔদরিক কালচার নয়। এর সঙ্গে ফুলের বন জড়িয়ে আছে। কমল বন আছে। শিল্পীর সৃষ্টির পক্ষে সবচেয়ে কোমল উপকরণ নবনীত সদৃশ মোম এর সঙ্গে সঙ্গে আছে। মৌমাছির জীবনে জৈব প্রবৃত্তির এক বিরাট প্রকাশ রয়েছে। মৌচাকের গঠনে জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতি। মৌচাকের অভ্যন্তরে সমাজ রয়েছে, যে সমাজের রীতিনীতিতে কত বিচিত্র সত্য কাজ করছে। দেখবার, শিখবার ও বুঝবার মত এক পরম গবেষণার আধার এই মৌচাক।

* * * * *

গান্ধীজী বলেছেন মানুষের শ্রমের আদর্শ হবে মৌমাছির মত। মানুষের তৈরী পণ্য হবে মধুর মত—পৃথিবীর কোন ফুলের প্রাণকে আঘাত না করেও তারই ভেতর থেকে প্রয়োজনের পণ্য সৃষ্টি হতে পারে। একমাত্র এই পণ্যই নিষ্কলঙ্ক পণ্য। মানুষের শ্রম হবে মধুকরের শ্রম—এই শ্রমের মধ্যে শিল্পীর সাধনা, গানের গুঞ্জন, কাব্য, বিজ্ঞান বিচিত্রতা, সামাজিকতা শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য ও সাম্য—একই বিধানে মিশে আছে। একটি অখণ্ড পরিপূর্ণ কাজের জীবনের আদর্শ। কাজের মধ্যেই গান, কাজের মধ্যেই শিল্পসৃষ্টি, কাজের মধ্যেই রোমান্স।

* * * * *

গান্ধীজী প্রবর্তিত গ্রাম-উদ্যোগের মধ্যে মৌমাছি পালন অন্যতম বিষয়। এই নূতন শিল্পটির একটি বড় অর্থ আজ আমরা নতুন করে

উপলব্ধি করতে পারি। একটি পুষ্টিকর খাদ্যবস্তুকে শুধু বেশী করে পাওয়ার জন্যই এই প্রচেষ্টা নিশ্চয় নয়। শ্রম ও রুচির একটি বড় আদর্শকে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার সুযোগ এর মধ্যে রয়েছে। সব খেয়ালের বড় খেয়াল, সবচেয়ে সুন্দর Hobby, বিজ্ঞানে ও কবিত্বে মণ্ডিত এই একটি খেলা যদি ঘরে ঘরে সত্য হয়ে ওঠে, জাতির মন কী মধুর ঐশ্বর্যে ভরে উঠবে, তা অনুমান করতে পারি।

জানিনা, চৌষট্টি কলার মধ্যে মৌমাছি পালনের স্থান আছে কি না। কিন্তু মানুষের মনের ধর্মের উপযোগী এর চেয়ে বড় আর্ট আছে বলে মনে হয় না। মৌমাছির মত ফুলবিলাসী রাগী পতঙ্গও তার প্রবৃত্তি ভুলে যায় যে মমতার খেলায়, যে খেলার প্রয়োজনে ঘরের আঙ্গিনায় যুঁই, গন্ধরাজ ও গাঁদা ফুলের বর্ণ ও সৌরভকে আমন্ত্রণ করতে হয়, এ হলো সেই খেলা। অ্যালসেসিয়ান আর টেরিয়ার পুষে অনেক ফ্যাশানের পরীক্ষা আমাদের হয়ে গেছে। একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি—Bee-Culture আমাদের কালচারকে ছোট করে না বড় করে?

বানর ও বাবুই পাখি

এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকা এই খবরটি প্রচার করেছেন—"সেণ্ট চার্লস (ভার্জিনিয়া), ৩০শে জুলাই—গতকল্য ভার্জিনিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের পাঁচ হাজার রেড ইণ্ডিয়ান গলায় র‍্যাটল স্নেক এবং কপারহেড প্রভৃতি বিষধর সাপ জড়াইয়া সর্প-পূজা করিতেছিল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া এই অদ্ভুত অনুষ্ঠানে বাধা দেয়। তখন সর্প-পূজক রেড ইণ্ডিয়ানেরা উন্মত্তভাবে চীৎকার করিতে আরম্ভ করে। সর্পগুলিকে গলায় জড়াইয়া লইয়া উহারা আদর করিতে থাকে। সৈন্যগণকে উহাদের গলা হইতে সাপগুলিকে মাটিতে ফেলিয়া দিতে বাধ্য করে এবং সাপগুলি মারিয়া ফেলে।"

সংবাদদাতা ঘটনাটিকে 'অদ্ভুত' আখ্যা দিয়েছেন।

* * *

এই সংবাদটির মধ্যে আমরা তথাকথিত সভ্য মনোবৃত্তিরও একটি উদাহরণ দেখতে পাই; সেণ্ট চার্লসের সংবাদদাতার লেখা উচিত ছিল—সৈন্যদল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া এই অদ্ভুত অনুষ্ঠানে কিম্ভূতের মত বাধা দেয়।"

ঐ অনুষ্ঠানের দৃশ্যটা একবার কল্পনা করা যাক্। পাঁচ হাজার রেড ইণ্ডিয়ান গলায় সাপ জড়িয়ে শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ে পূজাসনে বসে আছে। তাদের দক্ষিণে টেনেসির দেবদারু অরণ্যের সীমাহীন শোভা, বামে কেণ্টাকির গিরিমালা। সারা উপত্যকার গায়ে প্রভাত সূর্যের আলোক ছড়িয়ে পড়েছে, উৎসবের আকুলতায় সাড়া দিয়ে বনান্তের বাতাস ভেসে আসে। পূজারীদের কণ্ঠলগ্ন হাজার হাজার কপারহেড ফণা তুলে বিহ্বল শ্বাসবায়ুর

গর্বে হিস্‌হিস্ শব্দ করে। তারই সঙ্গে সুর মিলিয়ে হাজার হাজার র‍্যাটল স্নেকের দেহভঙ্গীর উৎফুল্লতায় ঝুম্‌ঝুম্ মন্দিরা বাজে। ফণিমালায় বিভূষিত মহাযোগীরূপী পাঁচ হাজার শিব বসে আছেন ধ্যানস্থ হয়ে।

*　　*　　*　　*

চার্জ! ডিসপার্স! হঠাৎ এক রূঢ় হুংকার শোনা যায়। রাইফেলধারী কয়েক শত সৈনিক, কয়েক শত শ্বেতসভ্যতার পাহারাওয়ালা, পূজারী রেড ইণ্ডিয়ানদের আক্রমণ করে। সন্ত্রস্ত পূজারীদের গলা থেকে হাজার হাজার ফণিমালা খসে পড়ে। সৈনিকেরা সাপগুলিকে তাড়া করে হত্যা করতে থাকে। ভীত ও আহত সাপগুলিকে গলায় জড়িয়ে রেড ইণ্ডিয়ানেরা আদর করে, সান্ত্বনা ও সোহাগে শান্ত করে তোলে। পর মুহূর্তে আবার আক্রমণ হয়। তাদের উৎসব-সহচর হাজার হাজার সঞ্চারিণী জীবল্লতার শবের দিকে তাকিয়ে থাকে। শোকার্ত পূজারীদের কান্নায় ভার্জিনিয়ার উপত্যকা করুণ হয়ে ওঠে।

*　　*　　*　　*

এই যদি সভ্য আচরণের উদাহরণ হয়, তবে আজ আবার নতুন করে একটা পুরানো প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়ায়। তবে শুধু ভ্যাণ্ডালেরা (Vandal) কেন ইতিহাসে এত কুখ্যাত হয়ে আছে? কালাপাহাড় তাহলে একাই দোষী হবেন কেন? যাকে বুঝাবার মত শক্তি নেই, যা নিতান্তই অভিনব, যা অপরিচিত—তাকে ভেঙে দেওয়া এবং মেরে ফেলাই বোধ হয় সভ্যতার রীতি। বাঁদর বাবুই পাখীর বাসা ছিঁড়ে ফেলে দেয়। যে উন্নত জৈবিক প্রবৃত্তির অনুগ্রহে বাবুই পাখী শিল্পী হতে পেরেছে, বাঁদরের তা নেই। বানরীয় সভ্যতায় তাই বাবুই পাখীর বাসার কোন মূল্য নেই। সেটা সম্পূর্ণ 'অদ্ভুত'—অতএব নিষ্প্রয়োজন।

২৯শে জুলাই তারিখে যে সৈনিকেরা রেড ইণ্ডিয়ানদের গৃহপালিত

সাপগুলিকে মেরে ফেললো, একশো বছর আগে এই সৈনিকদের প্রপিতা-মহের দল ঐ রেড ইণ্ডিয়ান পূজারীদের প্রপিতামহের দলকেই ঠিক এই ভাবেই সভ্যতার অহঙ্কার নিয়ে এবং সভ্যতার দাবীতেই মেরে ফেলতো। একটি রেডইণ্ডিয়ানের খুলি কলোনি অফিসে জমা দিলে আড়াই পাউণ্ড পুরস্কার পাওয়া যেত। সেই পুরাতন শিকারী মনোবৃত্তি আজ স্কাই স্ক্রেপারের লিফ্‌ট বেয়ে ওপরে উঠলেও 'উন্নত' হতে পারে নি।

* * * *

র‍্যাট্‌ল স্নেক এবং কপারহেড বিষধর সাপ। কামড়ালে মৃত্যু ঘটে। কিন্তু ঐ যে আদরিণী গৃহপালিত গাভীটি আঙিনায় কচি ঘাস খেয়ে ফিরছে, তার শিং আছে এবং গুঁতিয়ে দিলে মৃত্যু হতে পারে। আপনার নিত্য বৈকালের পোলো খেলার সঙ্গী ঐ আদুরে ঘোড়াটি চাট্‌ মেরে মৃত্যু ঘটাতে পারে। আর কী ভয়ানক হিংস্র আপনার পোষা অ্যালসেসিয়ানটি, যে কোন জীবের টুঁটি ছিড়বার জন্য ছটফট করছে। তবু এরা আপনার ঘরের জীব। এই সব গোধন আর কুকুরধন আপনার গর্বের সম্পদ।

অস্বীকার করা যায় না, এরা সত্যিই সম্পদ। মানুষের সংসারে এরা কাজের জীব হয়ে উঠেছে। কাজের সম্পর্কে এসেই এই সব পশুও কম-বেশী সামাজিক জীব হয়ে উঠেছে। গরু, ঘোড়া, কুকুরকে মানুষ আদর করে। এই আদরের কোমল করস্পর্শের গুণে গরু ঘোড়া ও কুকুরের মেজাজ থেকে হিংসা-ধর্ম মুছে গেছে। মেজাজ খারাপ না হলে এরাও হিংসা করে না।

তা ছাড়া শুধু আদরের দাবীতেই অনেক জীব মানুষের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। বনের কাকাতুয়াকে ধরে এনে মানুষ দাঁড়ে বসিয়ে রেখেছে, এটা নিশ্চয় অর্থকরী বিলাস নয়। কাকাতুয়াকে দেখতে ভাল লাগে, পোষ-

মানাবার মধ্যেই একটা আনন্দ আছে। এটা একটা সখ, একটা শিল্প, একটা রুচি। আদিম সমাজের ভাষায়, এটাই হলো 'যাদু'।

* * * *

পাঁচ হাজার র‍্যাট্‌ল স্নেক ও কপারহেড! ভাবতেই সভ্য মানুষের গা সির্‌ সির্‌ করে উঠে। কি সাংঘাতিক দৃশ্য! পাঁচ হাজার অপমৃত্যুর বিষ, পাঁচ হাজার শীতল শোনিতের লতা কিল-বিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখা মাত্র মেরে ফেলতেই ইচ্ছে করে।

হ্যাঁ, তাই হয়। কারণ ঐ রেডইণ্ডিয়ান পূজারীদের মনের মত মন আধুনিক আমাদের নেই। শ্বেত সভ্যতার পাহারাওয়ালাদের আরও বেশী করে নেই। যে আদরের আর্ট ও কৌশলে মানুষ একদিন বনের পশু, গরু, ঘোড়া ও কুকুরকে বশ করতে পেরেছিল, সেই আর্টেরই উৎকর্ষ রেড-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে এক উচ্চস্তরে পৌছেছে; আমরা পিছিয়ে আছি। আমরা তার খবরও রাখিনা। রেড-ইণ্ডিয়ানের চক্ষে কপারহেড ও র‍্যাট্‌ল স্নেক নিশ্চয় সুন্দর। রেড-ইণ্ডিয়ানের আদর সাপেরা বুঝতে পারে—বিষধর ভুজঙ্গের দল মন্ত্রশান্ত হয়ে থাকে। এই যাদুকরের গুণ, এই শিল্পীর গুণই সভ্যতার বিজ্ঞানে সব চেয়ে বড় গুণ, যে গুণের কারণে পশু ও মানুষ তার নিজ নিজ জৈব প্রবৃত্তি বদলে দিতে পারে—এক নতুন সামাজিক প্রবৃত্তি রচনা করে—মিলন ধর্ম।

এই পোষ-মানার গুণে, এই আদরের আর্টের প্রভাবে আধুনিক সভ্য মানুষের সংসারেই একটি প্রবৃত্তি-রূপান্তরের পরীক্ষা কিছুকাল হলো সফল হয়েছে। [illegible] কথা সবাই শুনেছেন। এই রাগী হিংস্রক পতঙ্গটীও আজ গৃহস্থের ঘরের সম্পদ, গর্ব ও লক্ষ্মীশ্রী হয়ে উঠেছে।

* * * *

তবে সাপের সম্পর্কে এত হতাশা কেন? পাঁচশো সাতশো বা এক

হাজার বছর পরে সভ্য মানুষের সংসারেই গোয়াল আস্তাবল আর মৌচাকের মত এক একটি সাপুড় বা সাপশালা থাকবে, এটা নিছক কল্পনা নয়। শুধু একটা ঘটনার অপেক্ষায় আমরা রয়েছি। অর্থাৎ সাপের বিষের কোন একটা বড় গুণ সদ্ব্যবহার বা উপকারিতা একবার আবিষ্কার হয়ে যাক্। অচিরেই এই ঘৃণাভাজন জীবটিই সবাকার প্রিয় হয়ে উঠবে, সকাল সন্ধ্যা পোষা সাপের বিষ দোহনের জন্য এক নতুন শ্রেণীর 'গয়লা' দেখা দেবে পৃথিবীতে, এ কল্পনাও অবাস্তব নয়।

* * *

আধুনিক সৈনিকের কোমরে পিস্তল ঝুলছে। এটা কি রকম ব্যাপার? যদি বলা যায়, কোমরে তারা এক একটি লোহার সাপ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে? যে কোন ক্ষণিক প্ররোচনা ও উত্তেজনায় অপরের মৃত্যু ঘটাতে পারে। আধুনিক মানুষের মোটর গাড়ীও এক একটি সাপ। যে কোন সময় যে কোন পথিকের প্রাণ নিতে পারে। এক কলকাতা সহরে বছরে যত লোক মোটর চাপা পড়ে মরে কোন জেলায় তত লোক সাপের কামড়ে মরে কিনা সন্দেহ।

পূজারী রেড ইণ্ডিয়ানের র‍্যাটল্ স্নেক হত্যা করে শ্বেত সভ্যতার পাহারাওয়ালারা যে কি পরম তত্ত্ব প্রমাণ করতে চান, তা বোধগম্য হয় না। একটি মাত্র যুক্তি, এই বিষধর সাপ যে-কোন মুহূর্তে কাউকে কামড়ে দিয়ে মৃত্যু ঘটাতে পারে। কিন্তু এই সভ্যদের একবার চ্যালেঞ্জ করা হোক্, মৃত্যু ঘটাবার কাল্চার তাঁরাই বা কি কম করেন? মোটর রেসে অপঘাত মৃত্যু হয় না কি? সার্কাসের যে সব বড় বড় লাফ ঝাঁপের কেরামতির মধ্যে যত বেশী মৃত্যুর আশঙ্কা আছে, সেই সব খেলাগুলিই সভ্যদের কাছে বড় মধুর। এই সভ্যদের বুকে পিঠে আজও সাপের ছবি

উল্কি করে আঁকা আছে। সাপ, বিছা, মাকড়শা ও কাঁকড়া প্যাটার্ণের গহনা সভ্যেরা তো খুব বেশী করেই ভাল বাসেন।

* * * * * *

যত দোষ করেছেন রেড ইণ্ডিয়ানেরা। কারণ তারা শিল্পীর গুণে ও যাতুকরের গুণে সমৃদ্ধ। তারা বিষধর সাপকে আদর করে বশ করতে শিখেছে। সভ্যেরা আজও এই আর্ট আয়ত্ত করতে পারেনি, তাই এই বনেদী মানুষ গোষ্ঠীর কীর্তিকে তারা হয়তো সইতে পারে না। বাবুই পাখির বাসা ছিঁড়ে নষ্ট করে দেওয়াই বানর সভ্যতার গর্ব।

কবি ও বিজ্ঞানী

"মোর উত্তরীয়ে—

রঙ লাগায়েছি প্রিয়ে"

কবি তাঁর উত্তরীয়ের প্রান্তখানি যদি নানা রঙে রঙীন করেই রাখেন, সেটা কি তাঁর অপরাধ? রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করেছেন—কবিকে মাত্র এই কারণেই নিছক রোমান্টিক বলো না, কবিরাও বাস্তবিক, কবিরা নিছক কল্পনাবাদী নন। বস্তুর গায়ে যদি তাঁরা রঙ ছিটিয়ে দেন, তাতে বস্তুর ধর্ম ক্ষুণ্ণ হয় না। বস্তু বস্তুই থাকে। মাঝখান থেকে মানুষ একটি নতুন জিনিষ লাভ করে—রূপ।

জল মাটী আকাশ জুড়ে জড় ও জীবনের লীলায় কত সহস্র বস্তু ছড়িয়ে রয়েছে। এ সবই আমাদের নিসর্গের দান, স্বাভাবিক পাওয়া। বাস্তবিকের। এই স্বাভাবিক পাওয়ার ওপরে উঠতে চান, তাঁরা বিজ্ঞানের বলে জড় জীবনের নানা নতুন প্রকরণ আবিষ্কার করেন। শুধু পথে কুড়িয়ে পাওয়া স্ফটিক নিয়ে বাস্তবিকেরা তৃপ্ত হন না। তাঁরা নতুন স্ফটিক তৈরী করেন। বাস্তবিকের সহায় বিজ্ঞান, ল্যাবরেটরী, বুদ্ধি।

* * * *

কিন্তু কবিই বা কিসে কম যায়? আকাশে ভূধরে জীবনের আঙিনায় শুধু পড়ে-পাওয়া রূপ, বর্ণ-গন্ধ-শব্দ নিয়েই শিল্পী ও কবিরা তৃপ্ত থাকেন না। তাঁরাও নতুন রূপ সৃষ্টি করেন। একই বেদনার চোখে তাঁরা নতুন অশ্রু আনেন, একই আনন্দের হর্ষধ্বনিতে তাঁরা নতুন সুর সঞ্চার করেন। বস্তুকে কখনো অবাস্তব করেন না কবিরা, বস্তুর রূপ ফিরিয়ে দেন।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

এ প্রাণ রাতের রেলগাড়ী
দিল পাড়ি
কামরায় গাড়ি ভরা ঘুম
রজনী নিঝুম।

কবিরাই বা কম বস্তুবাদী। প্রাণকে রাতের রেলগাড়ীর সঙ্গে তুলনা করলেন। রেলগাড়ীর মত একটা নিতান্ত আধুনিক কৃত্রিম সৃষ্টি, লৌহ কাষ্ঠ ও বাষ্পের একটা প্রচণ্ড পদার্থকীতির জিনিসকে উপমা হিসাবে প্রাণের মত এক দুর্জ্ঞেয় বিচিত্র ও অপার রহস্যের পাশে বসিয়ে দিলেন? রেলগাড়ীকে প্রাণ পবনের ডিঙ্গা নাম দিতে পারতেন কবি, কিন্তু দেননি। কবিরা রূপবাদী বাস্তবিক, কবিরা বস্তুবাদী রূপস্রষ্টা।

* * * *

কবিরা এইখানে এসে হঠাৎ হয়তো একটু গর্ব করে ফেলতে পারেন, বাস্তবিকেরা নাকি নেহাৎ বিরূপবাদী, বিজ্ঞানী বাস্তবিকেরা নিছক গন্তময় মানুষ। তাঁরা শুধু জড়ধর্মকেই পূজা করেন। পদ্মফুল দেখলেই তাঁদের পদ্মমধুর কথা মনে পড়ে, বকফুল দেখলে ভাজা করে খাবার বাসনা লালায়িত হয়ে ওঠে, সূর্য্যরশ্মির আভা তাঁদের মনে কোন পুলক জাগায় না, তাঁরা নাকি শুধু হিলিয়মের কথা ভাবেন।

* * * *

ভিত্তিহীন অভিযোগ। রোমান্টিক আর বাস্তবিকের এই বিবাদে কোন পক্ষের অহমিকাকেই প্রশ্রয় দেবার কোন কারণ নেই। রোমান্টিক বা ভাবুক কবি ও শিল্পীরা যেমন বস্তুবাদী, বাস্তবিকেরাও তেমনি রোমান্টিক ভাবুক ও রূপবাদী।

এইবার বাস্তবক্ষেত্রেই এসে একটু তুলনা করা যাক্।

স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির রূপকে শত শত কবি শত ছন্দে স্তোত্রে বন্দনা করে গেছেন। প্রত্যেকেই দেশ জাতি ও ভূমিকে এক একটি নতুন রূপে প্রকাশ করেছেন। আমাদের দেশের কথাই ধরা যাক। ভারতভূমির ইতিহাসকে কবিরা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। ভারত-ভূমির এক একটি রূপকে তাঁরা কল্পনা দিয়ে গড়েছেন। সুনীল জলধির হৃদয়োত্থিতা ভারতভূমিকে মানবতার শতদলরূপে কবি দেখতে পেয়েছিলেন। কেউ বা দেখেছেন তুষারকিরীটভূষিত ভারতভূমির রাজেশ্বরী মূর্তি। কেউ বা দেখেছেন সারা জাহানের চেয়ে নয়নাভিরাম গুলিস্তান রূপে। মাতৃভূমির পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গাকে মুকুতা হাররূপেই কেউ চিনতে পেরেছেন। কেউ অন্নদারূপে, কেউ দশপ্রহরণধারিণী রূপে।

কবিরা বিশ্বাস করেন—মেঘ কেটে যাবে, ভারতভূমির ললাটে আবার নতুন গরিমার ছটা ফুটে উঠবে।

* * * *

কবিদের ধ্যানে ভারতভূমির রূপ সত্য হয়ে আছে। কিন্তু বাস্তবিকেরা কি বলেন? বাস্তবিকের কাছে ভবিষ্যতের পটে কোন্ ভারতবর্ষের ছবি আঁকা হয়ে আছে? বাস্তবিকের এই ভারতভূমি কি কবিদের ধ্যানের ভারতভূমির চেয়ে কম রূপময়?

বাস্তবিকেরা হলেন প্ল্যানার। তাঁরাও ভারতভূমিকে গড়ে তুলতে চান। কিন্তু প্ল্যানারের চোখে স্বপ্ন নেই, প্ল্যানারেরা রূপবাদী নয় একথা বললে অন্যায় করা হবে।

দুটি বাস্তবিকের দুটি প্ল্যানের কথা মাত্র এখানে উল্লেখ করা গেল। রূপময়তার গুণে বাস্তবিকের বুদ্ধি দিয়ে গড়া এই ভারতবর্ষ কোন কবির

ধ্যানলব্ধ ভারতভূমির চেয়ে বড় না ছোট, এই তুলনামূলক বিচার করে আমরা বাস্তবিক ও রোমান্টিকের বিবাদ নিষ্পত্তি করে দিতে পারি।

*   *   *   *

মার্কিণ সাংবাদিক লুই ফিসারের কাছে গান্ধীজী বলেছিলেন—ভারতের সাত লক্ষ গ্রামে ইলেকট্রিসিটি চালু করতে হবে।

দীপান্বিতা ভারতভূমি। সত্যিই আমরা অনাগত সেই ভারতবর্ষের ললাটের নবীন গরিমার ছটা দেখতে পাচ্ছি। বস্তুর এক পরমা শক্তির প্রসন্নতাকে সাত লক্ষ গ্রামের হৃদয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষের মাটী ও বাতাসের প্রতি পরমাণুর তন্দ্রাভঙ্গ হয়েছে। বিজ্ঞানের বৈভব বিগ্রহের মত ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। নতুন গতি, নতুন বেগ, নতুন শব্দ, নতুন আলোকে ভারতভূমির সংসার ভরে গেল। নিজের ক্ষেতের ধানের মত, নিজের বাগানের ফুলের মত, গৃহপালিতা সুশীলা কপিলার মত কোটী বিদ্যুল্লতা ভারতের ঘরে ঘরে বিরাজ করবে। ভারতভূমির এক নতুন সুখদা বরদা ও অন্নদা মূর্তি।

*   *   *   *

ডাক্তার পট্টভি সীতারামিয়া এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেছেন—জাতীয় গবর্ণমেণ্ট সারা ভারতবর্ষে খাল কাটার (Irrigation) বন্দোবস্ত করবে, গঙ্গাকে কাবেরীর সঙ্গে যুক্ত করে দেবে।

বাস্তবিকের প্ল্যান রোমান্টিকের স্বপ্নকেও ছাড়িয়ে গেছে। লক্ষ লক্ষ মুক্তা হারের মত লক্ষ প্রবাহিকা সারা ভারতভূমির বুকে ছড়িয়ে থাকবে। প্রাচীন আর্যাবর্তের হৃদয় প্রাচীনতর দ্রাবিড়ের সঙ্গে এক ধমনীতে যুক্ত হয়ে যাবে। লক্ষ বছরের এক একটি পিয়াসী প্রান্তর আর উদাস মৃৎকণিকা রসিত হয়ে উঠবে। রেল লাইন দিয়ে বাঁধা ভারতভূমির শৃঙ্খলিত মূর্তির বিষণ্ণতা ঘুচে যাবে। প্রতি নহরের জলে গ্রামের ছায়া

টলমল করবে। ভারতের পুঞ্জীভূত বেদনা ও দারিদ্র্যের কলুষকে লক্ষ নবগঙ্গার জলে ধুয়ে নিয়ে যাবে। গাঁয়ের মন্দির মসজিদের মত, গাঁয়ের ছায়াগুরু বটবৃক্ষের মত গ্রামের আত্মীয় হয়ে শুচিতা ও তৃপ্তির পসরা নিয়ে ছোট ছোট সলিলস্রোত গ্রামের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যাবে। নতুন ভারতের এই লক্ষ জললতার দল প্রতি গ্রামের সই হয়ে থাকবে। সারা ভারতভূমির সেই এক বিগলিত করুণা সুজলা সুফলা মূর্তি।

এবং, হয়তো এক কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত্রে গ্রামবালিকার দল নহরের জলে লক্ষ লক্ষ প্রদীপ ভাসিয়ে ঘরে ফিরে যাবে। কোন এক উৎসবের প্রত্যূষে গ্রামবালকের দল লক্ষ কাগজের নৌকায় নাগকেশরের কুঁড়ি ভাসিয়ে দেবে।

কবি এবং প্ল্যানার, রোমাণ্টিক ও বাস্তবিক, ধ্যান এবং প্ল্যান—রূপ-সৃষ্টিতে কেউ কারও চেয়ে কম নয়। কেউ কারও প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। গঙ্গা ও কাবেরীর স্বপ্ন এক হয়ে মিশে যাবে।

ইতিহাসের উপেক্ষিত

ভারতবর্ষে নাকি অনেকগুলি সম্প্রদায় আছে। জাতীয় শাসনতন্ত্রে এই সব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব থাকা চাই। এই নিয়ম অনুসারে সিমলাতে একটা বৈঠক হয়ে গেল। সম্প্রাদায়গুলির নাম শোনা গেল—হিন্দু-মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ, পার্শি, অনুন্নত তপশীলী হিন্দু ইত্যাদি।

এই সব সম্প্রদায় নিয়েই ভারতবর্ষ। এই সব ভিন্ন ভিন্ন এবং বড় বড় সম্প্রদায়গুলিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব দিলেই নাকি গণতান্ত্রিকতা সার্থক হয়।

সিমলা আসরের চেহারাটা মনে মনে একবার কল্পনা করা যাক্। সব সম্প্রদায়ের লোক আছেন এর মধ্যে। সকলেই আসন গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তবু মনে হয়, কোথায় যেন একটা অপূর্ণতা রয়ে গেছে। ভারতবর্ষ বলতে আমরা যা বুঝি, সেই ধারণার মধ্যেই একটা গলদ রয়ে গেছে। এই আসরে একটি সমাদরের আসন পাতা হয়নি।···একটি যোগ্য অতিথি অনাহুত রয়ে গেছে।

হিন্দু-মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, পার্শী ও অনুন্নত হিন্দুকে একত্রিত করে বসিয়ে দিলেও আমার ভারতবর্ষের আসর পূর্ণ হয় না। এরা ছাড়াও আর একজন আছেন, যার অনুপস্থিতি এই ভারতের রাষ্ট্রীয় খসড়াকেও অসম্পূর্ণ করে রেখেছে।

* * * *

ইনি ভারতের আদিবাসী। আদিবাসীরা সংখ্যায় আড়াই কোটি। এই আড়াই কোটি মানুষের সংসারের সুখ দুঃখ বেদনার বাণী

শোনাবার জন্য কোন প্রতিনিধিকে আহ্বান করা হয়নি। তারা অরণ্যের ছায়ার আড়ালে সরে রয়েছে, শিক্ষিত ভারতীয়ের জাতিবাদ ও রাষ্ট্রীয়তা হয়তো ভুল করে আজও তাদের কথা স্মরণ করে উঠতে পারছে না। কিন্তু ভারতের মানবতার ইতিহাসে যারা প্রথম আবির্ভাব, ভারতের গভীর অরণ্যের কাঁটাগাছের গায়ে প্রথম কুঠারাঘাত করে যারা মানুষের বসতি স্থাপন করেছে, ভারতের শোন গঙ্গা সিন্ধু বিন্ধ্যাচলের জল আর পাথরকে যারা প্রথম স্পর্শ করেছে, শুধু তারাই কি অপাংক্তেয়?

ভারতের অধিবাসীদের সম্বন্ধে শিক্ষিত ভারতীয়ের ধারণা অনেক ভুল সংস্কারে আবিল হয়ে আছে। অনেকে আদিবাসীদের নিছক জংলী বলে মনে করেন। অনেকে মনে করেন, আদিবাসীরা আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটা মানবগোষ্ঠী। একটি নির্বাসিত জাতি। ধর্মে আচারে সামাজিকতায় ও ভাষায় আদিবাসীরা ভিন্নতর। তারা অনার্য।

* * * *

ভারতের একজাতীয়তা বা সাংস্কৃতিক সংগঠনের যে কোন প্রস্তাবের মধ্যে অজ্ঞাতসারে এক ধরণের আর্যামি দেখা যায়। আধুনিক ভারতীয়েরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে চিন্তা করার সময় এই প্রবীণতম ভারতীয়দের কথা অন্য-মনস্ক ভাবে ভুলে যান।

আমরা ভুলে যাই যে, আমাদের বহু দেবদেবীর প্রতিমাকে আমরা এই আদিবাসীর সংস্কৃতি থেকেই ধার করে এনেছি। আমরা ভুলে যাই যে, ভারতীয় সভ্যতার প্রথম প্রস্তরবিগ্রহটি আদিবাসী পুরোহিতের দ্বারাই স্থাপিত হয়েছিল। আমরা ভুলে যাই যে, আদিবাসীর নৃত্যগীতের বহু আঙ্গিক ও পদ্ধতি আমরা গ্রহণ করেছি। আদিবাসীদের বহু উৎসব এবং গাথাকেই আমরা একটু রকমফের করে আমাদের নানা যাগযজ্ঞ ব্রত ও পুরাণ

তৈরী করে নিয়েছি। আদিবাসীর সংস্কৃতি ও আধুনিক ভারতীয়ের সংস্কৃতি মধ্যে বহুদিন আগে থেকেই ঐতিহাসিক নিয়মে দেনার সম্পর্ক হয়ে গেছে। আদিবাসীরা মহাজন এবং আধুনিকেরা অধমর্ণ, এই দেনা আজও শোধ হয়নি।

* * * *

আধুনিক ভারতীয়েরা যে এই সাংস্কৃতিক ঋণ পরিশোধ করেন নি, তার প্রমাণ আদিবাসীরা আজও তাদের আরণ্য দীনতার মধ্যে রয়ে গেছে। যারা ভারতের প্রকৃত ভূমিজ, তারাই অন্ত্যজ অবস্থা লাভ করেছে। মনের দিক থেকে শিক্ষিত আধুনিক ভারতীয়েরা এখনো কি ভারতবর্ষকে তাঁদের উপনিবেশ মনে করেন?

টাটানগর একশত বৎসর আগে জঙ্গল ছিল। আজ সেখানে ব্লাস্ট ফার্ণেসে বিংশ শতাব্দীর ইস্পাত সভ্যতা চোখ ঝলসে দিয়ে জ্বলছে। কিন্তু এখনো এই টাটানগরের আশে পাশে, সিংভূমের জঙ্গলে নগ্নদেহ বিরহোর ঘুরে বেড়ায় পাথরের কুড়ুল কাঁধে নিয়ে। বিংশ শতাব্দীর গা ঘেঁসেই প্রস্তরযুগ এখনো অব্যাহতভাবে চলছে। অদ্ভুত দৃশ্য।

আদিবাসীদের ভাষা গান উৎসব সমাজ শিল্প সবই আছে। তাঁদের বাঁশীর সুরটি বিশিষ্ট, তাদের আঙিনায় আলপনার রঙ ও রীতি বিশিষ্ট। ভারতের আদি সংস্কৃতির পসরা আজও তারা বহন করে চলেছে। কিন্তু অন্য বিষয়ে তাদের সংসার দীনতর হয়ে গেছে। আধুনিক যুগের আইন তাদের জীবনে কোন নতুন অর্ঘ্য পৌছে দেয়নি, কিন্তু তাদের জীবনযাত্রার পাথেয় অন্নপথ্যের ওপর শাসন বিস্তার করতে কুণ্ঠিত হয়নি। তাদের হাজার বছরের পরিচিত বনস্পতিকে আইনের নির্দেশে পর করে দেওয়া হয়েছে। গাছের পাতাটুকুও কুড়িয়ে নিতে পারে না তারা, ফরেষ্ট আইন ভ্রূকুটি করে ওঠে।

ভারতের বনময় প্রদেশের গভীরে আজও সেই শবরী প্রতীক্ষায় রয়েছে। মহাজাতির পদধ্বনির সাড়া কবে তার কানে পৌঁছবে কে জানে! ভারতীয় সাংস্কৃতিকের উপেক্ষিত আদিভারতের তিন কোটি পুত্রকন্যার আরণ্য সংসারে জাগৃতির সাড়া যদি না জাগে, তবে নতুন ভারতের মূর্তি বিষণ্ণ হয়ে থাকবেই।

* * * *

আদিবাসী মানুষেরা নির্বাসিত হয়ে আছে। ঠিক এইভাবেই নির্বাসিত হয়ে আছে আর একজন। প্রসঙ্গক্রমে তারই কথা মনে পড়ছে। ভারতীয় সংস্কৃতির দরবারে ইনিও অগ্রাহ্য হয়ে আছেন। জাতি গঠনের অনেক সেবকদেরও মনে এই উপক্ষিতের আবেদন এখনো পৌঁছয়নি।

ইনি মানুষ নন, ইনি হলেন ভাষা। পোশ্‌তু ভাষার কথা মনে পড়ে।

মনে পড়ে, উত্তর পশ্চিম সীমান্তের ওপারে মেষপালক পার্বত্য পাঠানদের একটি উপত্যকা। ছোট পাথুরে কেল্লার মাথায় বৈকালী রোদের প্রলেপ লেগে আছে। দূরে রাস্তমাক রোডের ধাবমান মোটরবাসের উৎক্ষিপ্ত ধোঁয়া আর ধুলো দেখা যায়। চেনার গাছের তলায় বসে এক বৃদ্ধ পাঠান কবি বেহালা বাজিয়ে গাথা গাইছেন। যেমন মিষ্টি সুর, তেমনি মিষ্টি গলা। কঠিন পাথরের ওপর জলস্রোতের কোমলতাটুকু যেমন বেশী করে চোখে পড়ে, গিরিবহুল উপত্যকার রুক্ষ কঠিন রূপ ও স্তব্ধতার মধ্যে দরবেশের পোশ্‌তু ভাষার গান তেমনি কান্তকোমল ললিত পদাবলীর মতই মনে হয়।

পোশ্‌তু ভাষা ধ্বনি গুণে খুবই ঐশ্বর্যময়। পোশ্‌তু ভাষার লোক-প্রচলিত কাব্য কাহিনী ও রূপকথার প্রাচুর্য যে কোন ভারতীয় ভাষার সমতুল্য। সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয়, পোশ্‌তু লোককাব্যে রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের অজস্র পদাবলী ছড়িয়ে আছে।

এই পোশ্‌তু দুই কোটী লোকের মাতৃ ভাষা। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুর একাংশ, পাঞ্জাবের কিয়দংশ এবং আজাদ উপজাতীয় এলাকার সমস্ত জুড়ে পোশ্‌তু ভাষীর দেশ।

কংগ্রেস ভাষা হিসাবে ভারতের প্রদেশ বিভাগ করেছে। সরকারী ভূগোলের রীতি কংগ্রেস গ্রহণ না করে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু তবু একটা দুঃখের সঙ্গে মনে পড়ে, চেনার গাছের ছায়ায় পাঠান কবির সেই পোশ্‌তু গানের ভাষাকে। তার আবেদন এখনো কংগ্রেসেরও কানে পৌছয়নি। পোশ্‌তু এখনো প্রাদেশিক ভাষা হিসাবে গৃহীত হয়নি।

কিন্তু ভারতের জাতি গঠনের সাধনায় আজ আবার একটা নতুন সুর জেগে উঠেছে। এই সাধনায় কোথাও অপূর্ণতা থাকবে না। গান্ধীজীর আঠার দফা গঠনমূলক কাজের মধ্যে আদিবাসীরা যোগ্য আসন লাভ করেছে। সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেস নেতা ডাঃ খাঁ সাহেব পার্বত্য পাঠানের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন সংগঠনের পরিকল্পনা করছেন। মহাজাতির আবির্ভাব সকল লক্ষণ নিয়ে ভারতের চিন্তার আকাশে ফুটে উঠেছে। নতুন ভারতের আঙিনায় নানা হর্ষ কলরবের মধ্যে আমরা এক নতুন দরবারী রাগ শুনতে পাই—আদিবাসীর নির্বাসিত মাদল আর পার্বত্য পাঠান কবির উপেক্ষিত বেহালা নিজ নিজ সুরের বৈভবে যোগ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চলছে।

হারাণের কাহিনী

ছেলেটির নাম হারাণ। বছর পনর বয়স। দক্ষিণ বাঙলার চাষী গেরস্থের ছেলে—রোগাটে অথচ সুছাঁদ চেহারা। চলা ফেরায় দুরন্তপনা আছে, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে একটু ধ্যানী ভাব। মনে হয় এই বয়সেই এরা অনেক বুঝতে শিখেছে। সংসারের আলো বাতাসে শুধু ছুটোছুটি করে বেড়ালেই এদের চল্‌বে না, অনেক বোঝা বইতে হবে।

হারানের দিকে তাকিয়ে আমাদের তাই মনে হচ্ছিল। আমাদের জিনিষ পত্রের একটা বোঝা কাঁধে করে হারাণ আমাদের পেছু পেছু হেঁটে চলেছিল।

তখন শেষ রাত্রি। ফাগুন মাসের চাঁদ ঠাণ্ডা হয়ে আকাশ থেকে নেমে মাঠের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। তামাটে রঙের জ্যোৎস্নায় আকাশ-পটের একটা দিক আভাময় হয়ে আছে। অবারিত মাঠের বুকের ওপর দিয়ে জাঙ্গাল ধরণের একটা উঁচু কাঁচা সড়ক ধরে আমরা এগিয়ে চলেছিলাম, নৌকাঘাটার দিকে, খালের মুখে। এ জায়গাটাকে বলা যেতে পারে সুদক্ষিণ বাঙলা—জলের জোয়ারের মত সমুদ্র বাতাসের ছোট ছোট ঝড় প্রতি রাত্রে এখানকার নিম বাবলার শান্তি উতলা করে যায়। স্তব্ধ রাত্রির কোন মুহূর্তে হঠাৎ দূর সমুদ্রের ঢেউ-ভাঙ্গা এক একটা পলাতক আর্ত শব্দ ছুটে আসে। শেষ রাত্রি, ঘুমন্ত পৃথিবীর স্বপ্ন শীতল হয়ে আস্‌ছে। আমরা শুনতে পেলাম হারাণ গুন গুন করে গান গাইছে—

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, মোদের বাঁধন টুটবে।

এ গান কোথায় শিখলো হারাণ? আমরা ওকে জিজ্ঞাসা করলাম।

দক্ষিণ বাঙ্গলার গেঁয়ো চাষীর ছেলে হারাণ। ১৯৪২ সালের আগষ্টের

বনে ওরা অগোচরে একে একে ফুল হয়ে ফুটছে। হারাণের পা কখনো কাবু হবে না। পতাকা বইবার ভার চলে এসেছে ওদেরই ওপর। বাঙ্গলা দেশের গ্রামে নতুন মানুষের আবির্ভাব হয়েছে।

খালের মুখে এসে পৌছলাম। হারাণের গল্পও শেষ হয়ে এসেছে। আমাদেরই ওঠবার স্থবিধার জন্য নৌকাটাকে কাদার ওপর খানিকটা টেনে নিয়ে এল হারাণ। এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে হারাণ তার গল্প শেষ করলো—আজ কদিন হলো এই খালে হাঙ্গর ঢুকেছে বাবু। কাল রাত্রেই দুজনের পা কেটেছে।

তবু হারাণ এক হাঁটু জলের মধ্যে বেপরোয়াভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। হারাণের পৃথিবীর স্থলে জলে ও আকাশে শত্রুর হিংসা আর মৃত্যুর বিষ ভরপুর হয়ে রয়েছে। তবু ওরা থোড়াই গ্রাহ্য করে। ওদের বাঁধন টুটবে—দেশের গাঁয়ে গাঁয়ে হাজার হাজার হারাণ আজ এই বিশ্বাস নিয়ে দাঁড়িয়েছে। ওদের পা কখনো কাবু হয় না।

পথের পরিচয়

কলকাতা সহরে রাজপথ আছে। কিন্তু পুরাতন ভারতবর্ষের তক্ষশীলা পাটলিপুত্র বা উজ্জয়িনীর ধ্বংসস্তূপ থেকে কোন সমাহিত কঙ্কাল যদি হঠাৎ রক্তমাংসে সজীব হয়ে উঠে কলকাতার পথের ওপর এসে দাঁড়ায়, যদি প্রশ্ন করে—রাজকতা কই? এই সোজা সরল প্রশ্নের উত্তরটি উঠে তখুনি দিতে পারবে না। কিছুক্ষণ তাকে ভাবতে হবে। ভয়ে ভয়ে, ক্ষোভে, লজ্জায় চারদিকে তাকাতে হবে। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে শুধু আঙুল তুলে দেখিয়ে দিতে হবে—ঐ মনুমেণ্ট।

এর পর কি ব্যাপার হবে, তা'ও অনায়াসে অনুমান করতে পারা যায়। উজ্জয়িনীর কঙ্কাল সেই মুহূর্তে লজ্জায় শিউরে উঠবে, তারপর মাটীর ভেতর লুকিয়ে পড়বে। আর কোন সাড়া পাওয়া যাবে না।

* * *

সত্যিই তো, রাজকতা কই? শোভা কই? হর্ষধ্বনি কই? ভারত-বর্ষের মানুষ তার চোখে পাটলিপুত্র তক্ষশীলা ও উজ্জয়িনীর রাজকতার ছবি স্বপ্নময় আবেশ নিয়ে এখনো দেখা দেয়। বহু শতাব্দীর সুশ্রী নাগরিকতার চেতনা এখনো ঐতিহ্যের সূত্রে তারই সত্তায় মিশে আছে। তার পথের দু'পাশে বর্ণের আলিম্পন চাই। ভূষণে আভরণে ও সুখী-জীবনের কলহাস্যে সুন্দর নরনারীর শোভাযাত্রা পথ ধরেচলেছে—তার দু'চোখ উৎসুক হয়ে শুধু এই দৃশ্যই দেখতে চায়। নগরের পথেই দাঁড়িয়ে সে কপোত ও ময়ুরের কলালাপ শুনতে চায়। তরুচ্ছায়ার তলেই ক্লান্ত শরীর জুড়িয়ে নিতে চায়। নগরের পথে দাঁড়িয়ে সে মাটীর দিকে

তাকিয়ে তৃণের শ্যামলতা ও আকাশের দিকে অপার নীলিমার বিস্ময় দেখতে চায়। ভারতবর্ষের নাগরিক চায় না, আস্তাকুঁড়ের ধুলো ও ধোঁয়ায় তার আকাশের রামধনু ঢাকা পড়ে যাক।

রাজপথে দাঁড়িয়ে রাজকতা আশা করাই স্বাভাবিক। পথের পাশে মণিকুট্টিম, মরকত শিলার বেদী ও স্ফটিকময় ধারাযন্ত্র শীকর উৎক্ষেপ—এই রাজসিক রূপের ছবিই ভারতের রাজপথের পথিক দাবী করে। বৈভবেরও একটা ভারতীয় আদর্শ আছে।

* * * *

তাইতো কলকাতার বড় বড় কংক্রীটের বাড়ীগুলিকে 'ভবন' বলতে কুণ্ঠা বোধ হয়। বাড়ীগুলির বিরাটত্ব আছে, বড়মানুষী আছে, আকার এবং প্রকার আছে—কিন্তু বৈভব নেই। কলকাতা সহর যেন একটি সুবিস্তৃত দুর্গ। খাঁচায় ভাগ করা এক একটি জীবনের মহল্লা। পীচঢালা ও মেটালগাঁথা পথগুলি যেন কঠিন ও মসৃণ বধ্যভূমির মত। শত রকম মৃত্যুর যান ও যন্ত্র এই পথের ওপর অবাধে পিচ্ছিল আনন্দে ছুটে চলে। শুধু অবাধে ছুটে চলতে পারে না মানুষ। মানুষের ভাষা মুখচোরা হয়ে আছে। আশে পাশে সংশয়। প্রতিটি ন্যায়ের দাবীর সম্মুখে ঘুসের অপচ্ছায়া হাত পেতে আছে। প্রতি ন্যায্য মূল্যের প্রতিদান ভেজালের ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। এখানে মানুষ আইন চালায় না, আইন মানুষকে চালায়।

* * *

শোভা নেই, দৃশ্য নেই, রাজকতা নেই—তবু কলকাতার রাজপথে আমরা শোভা খুঁজি, আশ্বাস খুঁজি, স্বস্তি খুঁজি। সারা মনুষ্যত্বই যেন খুঁজতে খুঁজতে সন্ধানহীন শিকারীর মত দিশেহারা ও উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

তবু এই কলকাতা সহরে বসেই বর্ষার দিনে আকাশের আশীর্বাদের

মত ঝলঝরা গান শুনতে পাওয়া যায়। নিভৃত কল্পনার পথে সাড়া শুনতে পাই; কবি কালিদাস যেন মেঘদূত আবৃত্তি করে আমাদের হৃদয়ের কাছ ঘেঁসে চলেছেন। পরমুহূর্তে চোখে পড়ে, কলকাতার রাজপথে নোংরা পঙ্কিল জলের প্লাবনে ভিখারীর ছেঁড়া কাঁথা ভেসে চলেছে।

কালিদাসের মেঘদূতের সাড়া তখুনি স্তব্ধ হয়ে যায়। শুধু মনে পড়ে আমরা কলকাতায় আছি। লক্ষ দুঃখীর কাঁথা জলে ভাসিয়ে দিয়েই যেন কলকাতা সহর এইভাবে নিরেট লোভের কংক্রীটে কঠিন হয়ে উঠেছে। এই সহরের রাজপথে অনেক কিছু বাঁচাবার জন্য অনেক আইন আছে। কিন্তু ভিখারীর কাঁথাটুকু বাঁচাবার সামর্থ্য কোন আইনের নেই।

* * * *

গঙ্গাপুলিনের সৌন্দর্য যুগ যুগ ধরে ভারতের কাব্যের এবং কাব্যিকের চেতনার সম্পদ হয়ে আছে। কলকাতার অদৃষ্টের অভিশাপ, এই গঙ্গাপুলিনও তার কাছে ব্যর্থ হয়ে গেছে। গঙ্গাতটের অপমান, পশ্চিমী সভ্যতার অনুগ্রহে এই একটি বড় অবদান লাভ করেছি। কলকাতার গঙ্গা বণিকের চোখে অববাহিকা মাত্র। গঙ্গার প্রতি ঢেউয়ের ওপর লুব্ধ বাণিজ্যপোতের ছন্দোহীন আঘাত। চটকলের পুরীষ আজ গঙ্গোদকের স্বচ্ছতাকে ছাপিয়ে কলকাতার কাল্‌চারকে বড় করে তুলেছে। গঙ্গার সৈকতে ভোর বেলার পূজারীকে সসঙ্কোচে আসনখানি সরিয়ে আর একটু দূরে বসতে হয়—অপহৃত মনুষ্যত্বের ভ্রূণপিণ্ড তার পাশেই হয়তো নারকীয় আবেশ সৃষ্টি করে। এসবই কলকাতার কৃপা।

* * * *

সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে বিকেল, তারপর সন্ধ্যা। কলকাতার রাজপথ দিয়ে আমরা ভারতবর্ষের মানুষ বিদেশীর মত ছন্নছাড়া হতাশা আর পুঞ্জীভূত ব্যর্থতার বোঝা নিয়ে ঘুরে বেড়াই। অন্ধকার ঘনায়,

আলো জ্বলে। শুধু সরে যেতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোন খানে।

কলকাতার রাজপথের পথিক, ভারতের মানুষ, এইভাবে প্রতিদিন পথে বের হয়, কিন্তু ঠিক পথ-চলার আনন্দ যেন তার নেই, পলাতক বন্দীর মত পথ খুঁজে বেড়ায়। হঠাৎ একদিন পথ-ভোলা ঝড়ের মত একটা ঘটনা দেখা দেয়, কলকাতার পথিকের শোভাযাত্রার উপর সৈনিকের রাইফেল ঝল্‌কে ঝল্‌কে বারুদগন্ধী মৃত্যুময় আগুণ বর্ষণ করে।

সন্ধ্যা হয়ে আসে, টাসিগঞ্জের টিপু সুলতান রোড, যেন শ্রীরঙ্গপত্তনের দুর্গের স্বপ্ন দারুণ অভিমানে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পথের খোয়া হয়ে পড়ে আছে। সেই স্বপ্ন মথিত করে বিদেশী মিলিটারী রথের চাকা উদ্দাম বেগে দৌড়ে যায়।

এমনি এক নবেম্বরের সন্ধ্যায় ভারতের পথিককে টালিগঞ্জের এক ছোট পথের অন্ধকারে ক্ষণিকের জন্য থমকে দাঁড়াতে হয়। এক রিক্সা থেকে গুলীবিদ্ধ আহত ছাত্র-যুবক নামে। পথের ওপর কপালে হাত চেপে বসে পড়ে। কেউ তাকে চেনে না, জানে না।

তেমনি অচেনা এক পথিক তরুণী পথে যেতে যেতে হঠাৎ সেখানে থম্‌কে দাঁড়ায়। আহত যুবকের দিকে তাকিয়ে থাকে। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে নাম-না-জানা ভাইয়ের হাত ধরে।

আহত যুবকের হাত ধরে টালিগঞ্জের ছোট রাস্তার অন্ধকারে পথ দেখিয়ে ভারতের চিরকালের ভগ্নীহৃদয় যেন এগিয়ে যেতে থাকে। দূরে দাঁড়িয়ে ভারত পথিক সেই দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। সব হতাশা, সব ব্যর্থতা, সব নিঃস্বতা মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে যায়।

টালিগঞ্জের ছোট রাস্তার অন্ধকার। অচেনা আহত যুবক। তারই

পাশে এক অচেনা তরুণী। ধীরে ধীরে এই ছবি দূরে সরে যেতে থাকে। শুধু পথিক তরুণীর কবরীতে দুটি জোনাকী বন্দী হয়ে ঝিক ঝিক আলো ছড়ায়। অন্ধকার ভয়ে শিউরে ওঠে।

দানবিক ও আণবিক

প্রায় পঁচিশ বছর আগে মিঃ এইচ জি ওয়েল্‌স্‌ একখানি উপন্যাস লিখেছিলেন, তার নাম—দি ওয়ার্ল্ড সেট ফ্রী (The World Set Free)। এই উপন্যাসের কাহিনীগত ব্যাপারটুকু সংক্ষেপে এই:— সেবার প্রাচ্যদেশীয়েরা অনেকখানি সাধনা করে ফেলেছে। জাতিতে জাতিতে বিরোধিতা লেগেই রয়েছে। হঠাৎ একদিন দেখা গেল লণ্ডন সহরের ওপর বায়ুমণ্ডলের এক অতি উচ্চস্তরে একটি বিচিত্র বিমান উড়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে দুটি অত্যন্ত প্রতিভাবান বাঙালী বৈজ্ঞানিক আছেন, একজনের নাম 'দাস' অপর জনের নাম 'টাটা'। এই দুই বৈমানিক লণ্ডন সহরের ওপর একটি আণবিক বোমা নিক্ষেপ করলেন। লণ্ডন রসাতলে গেল। তারপর প্যারিস, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রাচ্যদেশীয়ের বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্রের আঘাতে য়ুরোপের চৈতন্য সায়েস্তা হলো। জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হলো।"

* * * *

এইচ জি ওয়েলসের কল্পনার বোমা সত্যিই এতদিন পরে ফেটেছে। জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি রসাতলে গেছে।

দেখা যাচ্ছে মিঃ ওয়েলসের কল্পনায় একটা বড় ভুল হয়েছিল— পশ্চিমীরাই প্রাচ্যের ওপর আণবিক বোমার খেলা প্রথম দেখিয়ে দিল।

যাই হোক, সবচেয়ে বড় কথা হলো—আণবিক বোমা ফেটেছে। চার্চিল সাহেব বলেছেন—'এই আবিষ্ক্রিয়া মানব প্রতিভার বিরাটতম সাফল্যের নিদর্শন।' ধ্বংসের প্রতি এত বিরাট অভিনন্দন বোধ হয় আজ পর্যন্ত কোন ভদ্রলোক জানাতে পারেন নি। মানবের 'দুষ্প্রতিভার' এত

বড় নিদর্শনের গলায় প্রথম বরমাল্য দিতে পারেন তিনিই যাঁর অভিধানে 'প্রতিভা' 'বিরাট' 'সাফল্য' ও 'নিদর্শন'—এই চারটি কথারই অর্থ উল্টো করে লেখা আছে।

* * *

কিন্তু য়ুরোপের জনমত আর চার্চিল সাহেবের মতে অনেক পার্থক্য যে আছে তার নিদর্শন আমরা পাচ্ছি সংবাদপত্রের বিবরণে। নানা মুনি নানা মত দিচ্ছেন, কিন্তু খুব অল্পসংখ্যক ধ্বংসবাদী ছাড়া কেউ আণবিক বোমার আবির্ভাবকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করতে পারছেন না।

কেন পারছেন না?

এই জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর নয়। য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক, রাজনৈতিক ও চিন্তাশীল, সবারই বক্তব্যের সার হলো 'আণবিক বোমার মত এত ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রের সমর্থন করা যায় না।'

অর্থাৎ লক্ষ নরনারীর ও শিশুর প্রাণ সংহার করার এই যে নতুন আগুনটি দেখা দিল, তা চিরকাল কোন জাতির ঘরের লক্ষ্মী হয়ে থাকবে না। আজ আমেরিকার ঘরে আছেন, কাল তুরস্কের ঘরে চলে যেতে পারেন। কে কখন এই গোপন অগ্নিমন্ত্রটি শিখে ফেলে ঠিক নেই। এ আশঙ্কাও আছে যে, তিন চারজনে মিলে একটা প্রাইভেট কোম্পানী করে গোপনে একটা আণবিক বোমার কারখানা তৈরী করে ফেলতে পারে। তখন কী হবে উপায়?

* * * *

আণবিক বোমাকে এইভাবে তাঁরা বিচার করছেন। কিন্তু হঠাৎ একটা বেয়াড়া প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে—হঠাৎ আণবিক বোমা সম্বন্ধে এতটা চিন্তার সাবধানতা কেন? এত বিচার কেন? আণবিক বোমা খুব বেশী ধ্বংস করতে পারে, তার জন্য এত দুঃখ করার কি আছে?

যাঁরা রাইফেল সমর্থন করেন, যাঁরা টমিগান সমর্থন করেন, যাঁরা ইনসেন-ডিয়ারী বোমা সমর্থন করেন, আণবিক বোমাকেও তাঁদের সমর্থন করা উচিত। লাঠির চেয়ে রাইফেল বেশী মানুষ মারতে পারে, রাইফেলের চেয়ে বেশী ইনসেনডিয়ারী বোমা। যদি লাঠিবাদ নির্দোষ হয়, যদি রাইফেলবাদ গ্রহণীয় হয়, তবে আণবিক-বোমাতে আপত্তি করার কিছু নেই। কারণ রাইফেল ও আণবিক বোমার মধ্যে নীতিগত বা গুণগত পার্থক্য কিছু নেই। পার্থক্য যা কিছু তা হলো মাত্রার পার্থক্য (difference in degree)।

মারণমন্ত্রের সাধকেরা বছরের পর বছর এই উচ্চতর মারণতার জন্যই চেষ্টা করে আসছিলেন। আজ তা সফল হয়েছে। সুতরাং রাইফেলবাদীরা যদি আণবিক বোমাকে নিন্দে করেন, তবে সেটা নিছক ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু নয়।

*   *   *   *

অণোরণীয়ান—এই অণুই নানারূপে ও রূপান্তরে বিশ্ব-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। মহতোমহীয়ান হয়ে উঠেছে। মহত্তম এক দুনিরীক্ষ্য শক্তির রহস্য শুধু সৃষ্টির আবেগে তার প্রচণ্ড স্পন্দনকে ছন্দোপাত করে অণুরূপে গড়ে উঠেছে। সৃষ্টির মূলাধারে পৌঁছে তার বিধানকে চূর্ণ করার সাধ আজ সফল হয়েছে। পরমাণু চূর্ণ হয়েছে। এ যেন এক দৈত্যের উপাসনা। সৃষ্টির নিয়মকে তপোবলে ধরতে পেরেও, তাকে ধ্বংসের সাধনায় ঘুরিয়ে দিল।

এর পর বৈজ্ঞানিকেরা আর কোন্ নতুন 'আবিষ্ক্রিয়া' সফল করবেন কে জানে? চাঁদের আলো নিভিয়ে দিতে হবে, অথবা আকাশের তারাগুলিকে কক্ষভ্রষ্ট করতে হবে, এই রকম একটি বিরাটতর সাধনা হয়তো আরম্ভ হবে।

কোহিনুরের পুনরুদ্ধার

রূপকথার রাজপুত্র তার অ্যাডভেঞ্চারের আনন্দে অজগরের মাথার মণি চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যায়। রূপকথার কাহিনীকার তাঁর গল্পের অজগরকে 'ভিলেন' (Villain) হিসাবে আর রাজপুত্রকে হিরো (Hero) হিসাবেই পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যে-মুহূর্তে সেই মণিহারা ফণী বা অন্ধ অজগরের বেদনাবহুল পরিণামের দৃশ্যটি কল্পনায় ভেসে ওঠে, তখুনি রাজপুত্রকে আর হিরো হিসাবে মর্যাদা দিতে মন চায় না। হোক রাজপুত্র, তবু এ যেন এক লুণ্ঠক তস্করের কুকীর্তি, আর আমাদের 'ভিলেন' অজগর শত অপরাধের মধ্যেও ক্ষণিকের মত করুণার আস্পদ হয়ে ওঠে। ঐ মাথার মণি, তার জীবনের অলংকার, সেটা একান্তভাবে তারই নিজস্ব, তাকে চুরি করার অধিকার কারও নেই। বীর রাজপুত্রের দল রাক্ষসপুরীতে হানা দিয়ে মরণকাঠি চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যাক্, কেউ নিন্দে করবে না। কেন না ঐ মরণকাঠি সংসারের ঐশ্বর্য নয়। অ্যাডভেঞ্চারীর দল যতখুসী ড্র্যাগনের দাঁত চুরি করে সরে পড়ুক, কেউ দুঃখিত হবে না। কিন্তু মণি চুরি করা, তা সাপের হোক বা আর যারই হোক, সেটা ঠিক মহারথী প্রথা নয়।

রূপকথার রাজপুত্রদের মণি চুরির কীর্তি যদি বা কোনরকমে সহ্য করা যায়, কিন্তু মহাভারতের কর্ণ মহাবীরের কবচ-কুণ্ডল অপহরণের কৃষ্ণ, ডিপ্লোমেসি সহ্য করা সত্যই কঠিন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ডিপ্লোমেসির জয় হলেও, কাহিনীর সমগ্র জয়-পরাজয়ের বিচিত্র ইতিহাসের বহু ঊর্ধে কর্ণের ব্যক্তিত্ব এক অনুপম মহিমায় উন্নত হয়ে উঠেছে।

রূপকথার এবং পৌরাণিক কথার প্রসঙ্গ ছেড়ে এবার নিতান্ত আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রসঙ্গে আসা যাক্। এখানেও দেখতে পাই, সত্যিই

মণি চুরি হয়েছে। কবচ-কুণ্ডল অপহৃত হয়েছে। খৃষ্টীয় সভ্যতার অন্যতম প্রচারক ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় আধোগতি সম্পূর্ণ করার জন্য তার সংস্কৃতি অপহরণের যে চেষ্টা করেছেন, ভ্যাণ্ডালিজমের (Vandalism) ইতিহাসে সেটা একটা বিশেষ অধ্যায়রূপে নিশ্চয় স্থান লাভ করবে। প্রবাদ আছে, জুপিটার যাকে হত্যা করতে চায় আগে তাকে বুদ্ধিভ্রষ্ট করে নেয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের পদ্ধতিতে এই নীতি একটা বড় নীতি রূপে গৃহীত হয়েছে। ভারতের রাজনৈতিক দাসত্বকে চিরস্থায়ী করার জন্য ভারতবর্ষকে তার সাংস্কৃতিক গৌরব থেকে বিচ্ছিন্ন করবার কূটনীতি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যে এবং আড়ালে সর্বদাই পোষণ করে এসেছেন। এটা তাঁরা ভাল করেই জানেন যে জাতীয় চেতনার বাস্তব বাহক এবং ধারক হলো জাতীয় সংস্কৃতি। সুতরাং ভারতবাসীর জাতীয় সংস্কৃতিকে নিশ্চিহ্ন করতে পারলে, জাতীয় চেতনার কোন ভূমিকাই আর থাকবে না। বর্বর য়ুরোপের ভ্যাণ্ডালেরা রোমের শিল্প ধ্বংস করেছিল, এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতের ক্ষেত্রে যে ঠিক একই প্রেরণা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন অজস্র ঘটনায় তার প্রমাণ রয়েছে।

ভারতের কোহিনুর আর ভারতে নেই। পাণ্ডু রাজবংশের এই হীরকখণ্ড ভারতের ঐতিহাসিক উত্থান পতন ও বিপ্লবের প্রতীকের মত এক হাত থেকে অন্য হাতে গিয়েছে, আবার ফিরে এসেছে ; কিন্তু ইংরাজের হাতে পড়ে এই কোহিনুর প্রথম তিন টুকরো হয়ে গেছে এবং সেটা আজ ইংলণ্ডেশ্বরের মুকুটশোভা হয়ে রয়েছে। কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে পড়েছিলাম কোন কোন জনসভায় এই দাবী করা হয়েছে যে ভারতের কোহিনুর ভারতে ফিরিয়ে আনা হোক্।

কোহিনুরের পুনরুদ্ধার—এই কথার পেছনে বর্তমান নবজাগ্রত ভারতের সাংস্কৃতিক চেতনার একটা পরিচয় রয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতির যে সকল

ঐশ্বর্য ব্রিটিশ কূটনীতির ফলে অবহেলায় বিনষ্ট হয়েছে, যে সজীব ঐতিহ্যকে শ্বাসরুদ্ধ করে মৃতপ্রায় করে রাখা হয়েছে, তারই পুনরুদ্ধার প্রয়োজন।

কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কাঞ্চী-কাবেরী কাব্যে লিখেছেন:

"হায়রে ইংরাজ রাজ, করিলি গর্হিত কাজ,
তোরা নাকি কীর্তির প্রহরী ?
তবে কেন করি চূর, সেই বারবাটী পুর,
হিন্দুর গরিমা নিলে হরি ?"

কবি স্বয়ং কাব্যের পাদটীকায় এই কথা বলে মনস্তাপ করেছেন:

"বারবাটি দুর্গের প্রাকার পরিখাদির প্রস্তর লইয়া অধুনা কটক সহরের রাজপথ এবং প্রণালীপুঞ্জ তথা লসপয়েন্টের আলোকগৃহ নির্মিত হইয়াছে। পুরাতন কটক অর্থাৎ চৌদ্বারের অন্তর্গত কপালেশ্বর নামক দুর্গের প্রস্তর লইয়া বিরূপা নদীর আনিকাট অর্থাৎ প্রবাহ রোধক বাঁধ প্রস্তুত হইয়াছে। বলিতে অন্তঃকরণে লজ্জা হয় এবং পরিতাপ আসিয়া উদিত হয়, এই দুর্গ ভাঙ্গিয়া প্রস্তর প্রদানার্থে আমার প্রতিই ভারাপিত হইয়াছিল।"

কবির দুঃখ বুঝতে পারি। তিনি রাজকর্মচারী ছিলেন, সেই হেতু সরকারী নির্দেশ অনুসারে প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন স্বরূপ বিখ্যাত দুর্গটীর পাথর খুলে নিয়ে 'প্রণালী পুঞ্জ' নির্মান করার কাজ তদারক করতে হয়েছিল। কবির সংস্কৃতিপরায়ণ মন কেঁদে উঠেছে, এ যেন স্বদেশের সাংস্কৃতিক দেহ থেকে এক একটী পাঁজর খুলে নিয়ে ড্রেণ তৈয়ারী করার ব্যবস্থা। ইংরাজ সরকার ভারতের সংস্কৃতিকে কী চক্ষে দেখছেন এই উদাহরণ থেকেই তা অনুমান করা যায়।

মাদ্রাজের প্রত্নতাত্ত্বিক সার্ভের রিপোর্ট (Madras Archaeological Survey) ব্রিটিশ ভ্যাণ্ডালিজমের সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে। কৃষ্ণা ও গোদাবরীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে শত শত স্তূপকে উৎখাত করে সড়ক তৈয়ারীর কাজে

ব্যবহার করা রয়েছে। স্তূপের চিত্রোৎকীর্ণ পাষাণ স্তম্ভ ও বহু নিদর্শন আজ রাজপথের নীচে পড়ে পদপীড়ণের অভিশাপ মাত্র অর্জন করেছে। ঐতিহাসিক ফার্গুসন (Ferguson) সাহেবও ক্ষুব্ধ হয়ে বলতে বাধ্য হয়েছেন:

"Unfortunately many, including the largest of those (stupas) containing the most important remains have been used as quarries for brick and marble—not by natives only—but by Government Public Works Engineers, the record of whose vandalism in ulitising the materials is most deplorable".

গ্র্যাণ্ডট্র্যাঙ্ক রোডের পথিক আজ পথে যেতে যেতে দেখতে পাবেন, পথের পাশে মাঠের ওপর একটী বৃহদাকার পাথর বেদীর মত পড়ে রয়েছে। এই বেদী সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ব্রিটিশ কামানের বেদী, যার ওপর তোপ বসিয়ে বন্দী সিপাহীদের পাইকারীভাবে প্রাণদণ্ড দেওয়া হতো। পথিক যদি আর একটু ভালভাবে এই পাথরগুলিকে পরীক্ষা করেন, তবে দেখতে পাবেন এখনো তার মধ্যে চিত্র উৎকীর্ণ রয়েছে এবং এই চিত্র হয়তো মৈত্রী ও মহাকরুণার প্রতিনিধি তথাগত বুদ্ধের কাহিনীরই প্রতিচ্ছবি। জাপানীরা বৌদ্ধ মন্দিরের ধাতুময় ঘণ্টা গলিয়ে কামান তৈরী করেছিল, রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনার কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখিতভাবে প্রতিবাদ করেছিলেন, দেখা যাচ্ছে যে জাপানীরা ইংরাজেরই অনুসরণ করেছিল।

বেশী দূর নয়, কলকাতার হেষ্টিংসে গিয়ে দাঁড়ালেই একটি ব্রিটিশ বিজয়স্তম্ভ চোখে পড়বে। গোয়ালিয়র যুদ্ধে মারাঠাদের কাছ থেকে যেসব কামান অধিকার করা হয়েছিল, ইংরাজ সরকার তা আর আস্ত রাখতে পারেন নি, একেবারে ভেঙ্গে গলিয়ে একটা ব্রিটিশ জয়স্তম্ভরূপে তৈরী করে ছেড়েছেন।

জেনারেল কানিংহাম ভারতের প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে অনেক অনুসন্ধান

করেছেন এবং অনেক তথ্য আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু তবু রূপকথার রাজপুত্রের কম্‌প্লেক্স থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেন নি। সাঁচী স্তূপের প্রথম খননের সময় জেনারেল কানিংহাম বিখ্যাত বুদ্ধ শিষ্য শারিপুত্র এবং মোগ্‌গলনের দেহাবশেষ আবিষ্কার করেন। কারুকার্যশোভিত প্রস্তরাধারে এই দেহাবশেষ রক্ষিত ছিল। জেনারেল কানিংহাম দুই বুদ্ধশিষ্যের দেহাবশেষকে সমাধি থেকে তুলে নিয়ে সোজা কালাপানি পার করে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দিলেন। সুখের বিষয় বৌদ্ধ সমাজের আন্দোলনের ফলে আজ ষাট বৎসর পরে আমরা আবার শারিপুত্র এবং মোগ্‌গলনকে ফিরে পেয়েছি। তাঁদের দেহাবশেষ ইংলণ্ড থেকে ফিরিয়ে এনে আবার সাঁচী স্তূপে সমাধিস্থ করা হয়েছে।

আমাদের ঐতিহাসিক অধিকার ফিরে পেতে হলে, এটা যেমন রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তেমনি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সত্য করে তোলাই আধুনিক ভারতের জাতীয় পরিকল্পনা। ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে ও চারুকলায় যে ঐতিহ্যের শক্তি ও স্বাস্থ্য সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতির ফলে চাপা পড়েছে, তাকে পুনরুদ্ধার করে নতুন গরিমার আরোপ করতে হবে। অপহৃত কোহিনুর ফিরে পেতেই হবে।

গ্রামীণ সংস্কৃতি

মধ্য-এশিয়ার মরুভূমিতে একটি পরিত্যক্ত প্রাচীন জনপদের পাথর-বাঁধানো পথের ওপর একদিন প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ অরেলষ্টাইন দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখন সূর্য ডুবছে। মরুভূমির তরঙ্গায়িত বালুকার বিস্তার একদিকে পূর্বাকাশের আবছায়ায় গিয়ে মিশেছে, আর একদিকে অস্তাচলের রক্তাক্ত আলোকসাগর—শুষ্ক বালুকার ঢেউ তারই মধ্যে নিজের সীমাহীনতা ডুবিয়ে দিয়েছে। এইরকম একটি দৃশ্যের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন অরেলষ্টাইন। দূরে ও নিকটে সেই বালুকাময় নিরালা পৃথিবীর বুকে এক একটি সঙ্গীহীন সাদা পাথরের টাওয়ার দাঁড়িয়েছিল। এক হাজার বছর আগে প্রহরীরা এই টাওয়ারে দাঁড়িয়ে পাহারা দিয়েছে। তাদের নিষ্পলক চোখের দৃষ্টি একদিন মরুভূমির দিগন্তহারা বিস্তারের মধ্যে ভেসে ভেসে দূরায়ত শত্রুর সন্ধান করেছে।

এই প্রাচীন জনপদের অনেকখানিই ভেঙে-চুরে গিয়েছে—ধ্বংসস্তূপের মত খানিকটা বিষণ্ণ রূপ। কিন্তু অনেকখানি আজও একেবারে অটুট রয়ে গেছে। দেখে মনে হয়, জনপদবাসী মাত্র কিছুক্ষণ আগে অদূরে কোথাও দল বেঁধে উৎসবে যোগ দিতে গিয়েছে। আবার এখুনি ফিরে আসবে।

পথের ওপরে একটি পাথরের কৌটা পড়েছিল। অরেলষ্টাইন সেটা কুড়িয়ে নিলেন। পরমুহূর্তে তাঁর দৃষ্টি পড়লো দূরের একটি টাওয়ারের দিকে। টাওয়ারের কালো কোটরের মত ছায়াবৃত গবাক্ষ দিয়ে যেন কোন জাগ্রত প্রহরীর রুষ্ট চক্ষু তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অরেলষ্টাইন হঠাৎ শিউরে উঠলেন, তাঁর হাত থেকে কৌটাটা পড়ে গেল। নিতান্ত

অনধিকারীর মত তিনি যেন এই পরিত্যক্ত জনপদের সমাধিস্থ গাম্ভীর্যকে ক্ষুণ্ণ করেছেন, অমর্যাদা করেছেন। এক নিরীহ নাগরিকের সাধের জিনিষ তিনি যেন ভুল করে চুরি করছিলেন। টাওয়ারের গবাক্ষ থেকে একটা ভ্রূকুটি তাঁকে যেন সাবধান করে দিল।

মধ্য-এশিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের বৃত্তান্ত লিখতে গিয়ে অরেল-ষ্টাইন এই ঘটনাটি লিখেছেন। প্রত্নতাত্ত্বিকের সন্ধিৎসাপরায়ণ বৈজ্ঞানিক মন কিছুক্ষণের জন্য শোকাভিভূত হয়েছিল। অরেলষ্টাইন তাঁর এই বেদনার করুণতাকেও বর্ণনা করেছেন—কোথায় গেল এই সুন্দর জনপদের অধিবাসীরা? তাদের এত সাধের বাস্তু ও বস্তুময় সংসার পড়ে রয়েছে, কিন্তু সেই জীবনের নিশ্বাস ও হাসি-কলরব বিদায় নিয়েছে চিরকালের জন্য। মানুষ চলে গেছে—তাই জনপদকে আজ প্রেতলোকের একটি ভগ্নাংশ বলে মাঝে মাঝে ভয় হয়।

নগর-জীবনের মধ্যে কোথায় যেন একটা নশ্বরতার বীজ লুকিয়ে আছে। তাই অরেলষ্টাইনের এত আক্ষেপ। শুধু মধ্য-এশিয়ার এই নামহীন ক্ষুদ্র নগর নয়, পৃথিবীর সকল বিখ্যাত নগরের পরিণামের মধ্যে এই একই নিয়মের খেলা আমরা দেখতে পাই; উর, কিশ, ব্যাবিলন, মহেঞ্জোদাড়ো—স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বৈভব নিয়ে আজও প্রাচীন সভ্য মানবের অধিষ্ঠানগুলির নিদর্শন আমরা দেখতে পাই। সেই নগরগুলি আজও রয়েছে, কিন্তু নাগরিকেরা কোথায়?

সেই নাগরিকেরা কোথাও নেই। নগর ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সেই নাগরিক-সভ্যতারও ধ্বংস হয়েছে, শুধু তাদের রক্তমাংসের মনুষ্যত্বটুকু নানাদিকে ছড়িয়ে গেছে, মহামানবের সংস্র স্রোতে মিশে গেছে। মহেঞ্জোদাড়োর মানুষের শোণিত ভবিষ্যপুরুষের ধমনীতে প্রবাহিত হয়ে

এসেছে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে মহেঞ্জোদাড়োর সংস্কৃতিগত উত্তরাধিকার আসে নি।

নগর-সভ্যতার এই পরিণামের মধ্যে কার্য-কারণের পরম্পরাগুলি বিচার করে আমরা একটা তত্ত্বকে ধরতে চাই। অর্থাৎ, নগর-সভ্যতার এই ধ্বংসপ্রবণতার মূল কারণ কি? নগর-সভ্যতার উদ্ভব কি কি কারণে সম্ভব হয়েছিল? এই তথ্যগুলি বিচার করে, আমরা সভ্যতা সম্পর্কে একটা বৈজ্ঞানিক সূত্র আবিষ্কার করতে পারি কি না?

এর পর বিচার্য বিষয় হলো, গ্রাম-সংস্কৃতি বা গ্রামীণ-সভ্যতা। গ্রাম-সংস্কৃতি বলতে আমরা ঠিক কি বুঝি? এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য কি? নগর-সভ্যতার সঙ্গে গ্রামীণ-সভ্যতার পার্থক্য কোথায়? মানুষের রুচি, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কোন্ সংস্কৃতির স্বাভাবিক মিল আছে? বর্তমান পৃথিবীর সমাজ-বিজ্ঞানী পণ্ডিত সাহিত্যিক শিল্পী ও রাষ্ট্রীয় সাধকদের চিন্তাধারা কোন্‌দিকে চলেছে? ভাবী সমাজের রূপ অর্থাৎ সভ্যতার কোন নতুন বিচার ও সংজ্ঞা আমরা পাচ্ছি কি না?

প্রাচীন সভ্যতার পীঠস্থান-স্বরূপ নগরগুলির ধ্বংসের অনেক কারণ আছে। ঐতিহাসিকেরা সে-সম্বন্ধে অনেক রহস্য ভঞ্জন করেছেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আকস্মিক প্লাবন, ঝঞ্ঝা প্রভৃতির কারণে, আবহাওয়া অর্থাৎ শীতাতপের ঘোর পরিবর্তনের কারণে, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং রোগমারী ইত্যাদি সমাজ-বিরুদ্ধ পীড়া ও বিকারের কারণে—প্রাচীন নগরগুলি ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু কখনো এমন ঘটনা হয়নি যে, সেই নগরগুলির অধিবাসীরা হঠাৎ একটি দিনে সব মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। নগরে অতিষ্ঠ হয়ে, অর্থাৎ কোন কারণে নগরবাস অসহ্য বা অসম্ভব হওয়ায় ধীরে ধীরে মানুষের দল অন্যত্র চলে গেছে।

এইখানে একটা প্রশ্ন ওঠে, সেই সঙ্গে আমরা একটি তথ্যের সূত্র পাই।

মানুষেরা অন্যত্র চলে গেছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই নাগরিক-সভ্যতার ধারক ও বাহক হয়ে তারা যেতে পারে নি। তারা শুধু তাদের জীবন্ত দেহগুলি নিয়ে সরে পড়েছে, কিন্তু সংস্কৃতিগত রুচি মন ও শক্তিটুকু সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে নি। নগর ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তারা সংস্কৃতিগত শক্তিতে ও প্রতিভায় দীন হয়ে পড়েছে। মহেঞ্জোদাড়োর নগরের সঙ্গে সঙ্গে সেই ঐশ্বর্যপূর্ণ সংস্কৃতির লিপি, ভাষা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। নগর ধ্বংস হয়ে যাবার পর সেই সংস্কৃতি অন্যত্র বা নানাদিকে ছড়িয়ে পড়তে পারে নি। মহেঞ্জোদাড়োর মানবের রক্ত আজও মানুষের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু সেই রুচির ঐশ্বর্য কোন রূপান্তরের ভেতর দিয়ে বা কোন ক্রমিক উৎকর্ষের নিয়মে আমাদের মধ্যে আসে নি।

সুতরাং একটা সিদ্ধান্ত করতে হয়, মহেঞ্জোদাড়ো সংস্কৃতি একান্তভাবে মহেঞ্জোদাড়োর ইঁট-পাথর ইত্যাদি নাগরিকতার বস্তুগত বন্ধনের মধ্যেই সত্য হয়েছিল। সেই ইঁট-পাথর জীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে, অথবা পরিত্যক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই নগর-সংস্কৃতির মেরুদণ্ডও ভেঙে গেছে। দ্বিতীয় মহেঞ্জোদাড়ো আর গড়ে ওঠে নি। মানুষের ভাস্কর্য ও স্থাপত্য আজও আছে, ঐ সিন্ধু-উপত্যকাতেই পরবর্তীকালে আরও অনেক সভ্যতার পত্তন আমরা দেখতে পাই। কিন্তু তার মধ্যে মহেঞ্জোদাড়োর আর খুঁজে পাই না।

নাগরিক-সভ্যতার এই ভঙ্গুরত্ব সম্বন্ধে একটা কারণ আমরা নির্ণয় করতে পারি। এই সভ্যতা নিতান্তই বৈষয়িক গঠন বা কর্মের (Form) ওপর নির্ভর করে থাকে। অত্যন্ত ব্যবস্থিত আয়োজন, শাসন-বন্ধন এবং নিয়ম-তন্ত্রের মধ্যে এই নগর-সভ্যতার স্থায়িত্ব। অর্থাৎ মাত্র আচারগত সভ্যতা। এই আচার একান্তভাবে বৈষয়িক উপকরণের আশ্রয়েই পুষ্ট ও বর্ধিত। উৎকর্ষবান মানুষের শক্তির তিনটি স্তরভেদ আছে। সর্বনিম্ন

স্তর হলো আচার (Habit)। এই আচার একটা অনুশাসনের জোরেই বহাল থাকে। অনুশাসন না থাকলে আচারও লুপ্ত হয়। কিন্তু এই আচার যখন স্বভাবজ হয় তখনই আমরা আর একটু উন্নত শক্তি লাভ করি—যার নাম রুচি। 'রুচি' মানুষকে সচেতনভাবে প্রয়াসে নিযুক্ত করে। রুচিগত অনুশীলন দীর্ঘকালের সাধনায় প্রায় প্রবৃত্তির (instinct) পর্যায়ে গিয়ে পৌছায়। যে মানুষ প্রবৃত্তিগত ভাবে (instinctively) দয়ালু, সে মানুষ আচারগত দয়ালু বা রুচিগত দয়ালু মানুষের চেয়ে জীব হিসাবে উন্নত ও বেশী শক্তিমান্। কারণ, অনুশাসন বা বিধানের অভাবে আচার লুপ্ত হয়, প্রেরণার অভাবে রুচি নষ্ট হয়, কিন্তু প্রবৃত্তিগত আচরণ স্বয়ং-নির্ভর।

সংস্কৃতিতত্ত্ব বিচারের জন্য কয়েকটি দার্শনিক কথা বলে নিতে হলো। কারণ আমরা দেখতে পাই, নগর-সভ্যতার মানুষ তার সাধের নগর থেকে উদ্বাস্তু হওয়ামাত্র সকল উৎকর্ষ ও শক্তি হারিয়ে ফেলে। নাগরিক-জীবনে শুধু আচারগত দিকটাই দিন দিন পুষ্ট ও প্রবল হতে থাকে। রুচি ও প্রবৃত্তিগত দিক্ উপেক্ষিত থাকে।

এইবার গ্রাম-সংস্কৃতি বা গ্রামীণ-সভ্যতার বৈশিষ্ট বিচার করা যাক্। গ্রাম-সংস্কৃতি অর্থ মানুষেরই সংস্কৃতি, কিন্তু এই সংস্কৃতি নগর-সভ্যতা থেকে মূল ধর্মে ও প্রকৃতিতে ভিন্ন।

গ্রামীণ-সভ্যতার মূল আশ্রয় হলো মানুষ। গ্রামীণ-সভ্যতা মানবতা-সর্বস্ব। ব্যক্তি-মানুষ (individual) কতখানি উন্নত হলো, সেটাই গ্রামীণ-সভ্যতার পরিচয় ও মাপকাঠি। বৈষয়িক উপকরণ কতখানি সৃষ্টি করা হলো, তারই তুলনা করে মনুষ্যত্বের পরিমাপ করা গ্রামীণ-নীতিতে স্বীকৃত হয় না। গ্রামীণ-সভ্যতার অধিকারী যে মানুষ হতে পেরেছে, সে-মানুষ স্থানান্তরে গিয়ে বা অবস্থান্তরে পড়েও তার সাংস্কৃতিক

ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারে। বৈদিক যুগের মানুষ গ্রামীণ-সভ্যতায় পুষ্ট ছিল। একটা উপমা দিয়ে বিষয়টা ব্যাখ্যা করা যাক্। বৈদিক যুগের ঋষি-কবিরা বহু গাথা ঋক্ রচনা করেছিলেন। এগুলি তাঁদের প্রতিভার সৃষ্টি ও চিন্তার ঐশ্বর্য। কিন্তু সে সময় লিপি (Script) সৃষ্টি হয়নি। তবু আমরা গ্রামীণ-সভ্যতার একটি বিস্ময়কর শক্তি দেখতে পাই, লিপির অভাবে বা পুঁথির অভাবে ঋক্ মন্ত্র লুপ্ত হয়নি, মানুষ শ্রুতিধর হয়ে যুগান্তকাল ধরে সেই চিন্তাকে ধারণ ও বহন করে এনেছে। অর্থাৎ গ্রামীণ-সভ্যতায় ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত আত্ম-নির্ভর ও বহিরুপকরণ-নিরপেক্ষ ছিল। এই ঘটনার সঙ্গে একটা বিপরীত তুলনাও অনুমান করা যাক্। কোন অপশক্তির প্রভাবে দেশের ছাপাখানা এবং পুঁথিগুলি লুপ্ত হয়ে গেল। এর ফলে এই হবে যে, রবীন্দ্র-কাব্যের ঐতিহ্যের এইখানেই অবসান হবে, ভবিষ্যবংশীয়েরা শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা করে রবীন্দ্র-কাব্যের কতগুলি খণ্ড খণ্ড নিদর্শন আবিষ্কার করবে।

এখানে কেউ প্রশ্ন করে একটা বাধা দিতে পারেন। তা'হলে কি ছাপাখানা ইত্যাদি মানুষের যত বৈষয়িক আবিষ্কার আয়োজন ও উপকরণ, এই সবই বর্জনীয় ?

এটা অবান্তর প্রশ্ন। সভ্যতার মর্মগত সত্য এই যে—সমাজবদ্ধতা, সমাজব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উপকরণ, এই সবারই লক্ষ্য হলো ব্যক্তি-মানবকে উন্নত করা। ব্যক্তি-মানবের প্রতিভা, প্রবৃত্তি ও শক্তিকে কোন বিশেষ বস্তু বা ব্যবস্থার কাছে বন্ধক দিয়ে রাখা সভ্যতার লক্ষ্য নয়। গ্রামীণ-সভ্যতায় এই ব্যক্তি-মানবের উৎকর্ষের সম্ভাবনা আমরা পাই। নাগরিক-সভ্যতার মধ্যে একটা ব্যবস্থাগত বন্ধনের রূপটাই প্রবল। ব্যক্তিত্বকে এর মধ্যে কয়েদী করে রাখা হয়, তার স্বাভাবিক বিকাশকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। সমাজবিজ্ঞানী আশা করেন, ছাপাখানা নামে আবিষ্কার ও আয়োজন আজ

ব্যক্তি-মানবের স্মৃতি ও চেতনাকেই আরও প্রখর ও শক্তিময় করে তুলবে, যার ফলে ছাপাখানা হলেও, আমাদের চেতনা জাতি-স্মৃতি (Race Memory) রূপে সজীব থেকে রবীন্দ্র-কাব্যের ঐতিহ্যকে বহন করে চলবে। যদি সেটা না হয় তবে এই ছাপাখানা নামে আবিষ্কারের নৈতিক সার্থকতা ব্যর্থ হলো বুঝতে হবে! কারণ, স্মৃতিশক্তি নামে একটা মানবিক বৃত্তির স্বভাবজ উৎকর্ষ এই ছাপাখানার দ্বারা ব্যাহত হলো। মানুষের ধারণা ও মননশক্তি একদিন এমন অবস্থায় ছিল যেদিন এক থেকে দশ পর্যন্ত গুণতে তাকে এক ঘণ্টা ধরে মাটীতে আঁচড় কাটতে হয়েছে, দশটি লাঠি পুঁতে তার প্রথম ধারাপাতটি তৈরী করতে হয়েছে। কিন্তু তার মননশক্তি ঐ আদিম রূঢ় ধারাপাতের ওপর একান্তভাবে নির্ভর করে থাকেনি। ঐ লাঠি-পোঁতা ধারাপাতকে সে তার মননশক্তির ব্যায়ামের কাজে লাগিয়েছে। বৈষয়িক ব্যবস্থার সাহায্যকে অতিক্রম করে, ছাড়িয়ে উঠে, নিজের ব্যক্তি-প্রতিভাকে উন্নত করে সে এগিয়ে এসেছে। মানুষের গণিত সার্থক হয়ে উঠেছে তার মনের শক্তির মধ্যেই, ধারাপাত বা রেডি রেকনারের মধ্যে নয়। লাঠি-পোঁতা ধারাপাতের এখন আর প্রয়োজন নেই, মানুষ তিন ও চারের যোগফল এত সহজে বলে দিতে পারে যে ব্যাপারটা প্রায় একটা সহজ প্রবৃত্তিনিহিত শক্তি বলে মনে হয়।

মানুষের প্রথম সমাজগত চেতনার উন্মেষের প্রধান সত্যটির দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি, তবে বুঝতে পারি যে, সর্ব্বসাধারণকে অর্থাৎ সমষ্টিকে উন্নত করার জন্যই এই সামাজিকতার প্রয়োজন হয়েছিল। গ্রামীণ-সভ্যতার মধ্যে সামাজিকতার এই ঐতিহাসিক স্বরূপটি আজও লুকিয়ে আছে। গ্রামীণ-সভ্যতায় দীক্ষিত মানুষ এমন কিছু আবিষ্কার করে না, বা এমন কোন ব্যবস্থা বা উপকরণের প্রশ্রয় দিতে চায় না, যা ব্যক্তি-মানবের আচার রুচি ও প্রবৃত্তিকে ক্ষুণ্ণ করে। প্রাচীন মানুষ বাঁশী নামে যে যন্ত্রটি আবিষ্কার

করেছিল, সেটা ব্যক্তির প্রয়োজন ও প্রসন্নতাকে সুসিদ্ধ করার জন্যই। মানুষের শ্রুতিশক্তি ছন্দজ্ঞান ও স্বরশক্তিকে দুর্বল করার জন্য বা অবসর দেবার জন্য বাঁশীর আবিষ্কার ও প্রসার হয়নি।

এইবার একটা প্রতিবাদের যুক্তি তোলা যাক্। মানুষের যে-সব বৈষয়িক আবিষ্কার ও ব্যবস্থা, সে-সবই কি একমাত্র মানুষের ব্যক্তিগত শক্তি সামর্থ ও রুচি প্রবৃত্তিকে সাহায্য করে চলবে? এ ছাড়া কি আর কোন সার্থকতা নেই? মানুষ মোটরযান আবিষ্কার করেছে, এর ফলে মানুষের হেঁটে চলার শক্তি কমে যেতে পারে। কিন্তু সেই জন্যেই মোটরযানকে মানুষের জীবনযাত্রা থেকে বাতিল করে দেওয়া উচিত? দূর ব্যবধানকে অল্প সময়ের মধ্যে অতিক্রম করা যায় মোটরযানের সাহায্যে। সমাজ-জীবনের পক্ষে এই দিক্ দিয়ে মোটরযানের কল্যাণকর ধর্মটুকু উপেক্ষা করা যায় কোন্ যুক্তিতে?

এর উত্তর গ্রামীণ-সভ্যতার ধর্মের মধ্যেই রয়েছে।

যে কোন ব্যবস্থা ও বিজ্ঞানের দানকে সর্ব-ব্যক্তির আয়ত্তে ও অধিকারে রাখাই গ্রামীণ-সভ্যতার প্রকৃতি। বিশেষ শ্রেণী বা বিশেষ ব্যক্তির অধিকারে যখন কোন ব্যবস্থা বা আবিষ্কারকে সঁপে দেওয়া হয়, তখনি মানুষের সামাজিক ইতিহাসের তথা গ্রামীণ-সভ্যতার সত্যকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। ছাপাখানা নামে যন্ত্রসমন্বিত একটি ব্যবস্থাকে যদি কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর সেবায় নিযুক্ত রাখা হয়, সর্বসাধারণ অনধিকারী থেকে যায়, তা'হলে মাত্র অহিত সৃষ্টি হবে। গ্রামীণ-সভ্যতায় পুষ্ট মানুষের মন ও প্রতিভা তাই এমন সকল যন্ত্র ও উপকরণ আবিষ্কার করে, যা সর্বসাধারণের আয়ত্তযোগ্য হয়। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, মানুষের বৈজ্ঞানিক প্রেরণা মাত্র সেই ধরণেরই উপকরণ সৃষ্টি করে এসেছে, যা সর্বসাধারণের অর্থাৎ ব্যক্তি-মানবের শক্তির নিয়ন্ত্রণযোগ্য এবং অধিকারভুক্ত। লাঙল,

কাস্তে, ঢেঁকি, চরকা, তাঁত ও কুমোরের চাক ইত্যাদি সভ্যতার প্রবী· উপকরণগুলির পেছনে স্রষ্টাদের এই মনোভাবটিই স্পষ্ট হয়ে রয়েছে।

যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও উপকরণের সম্বন্ধে যে-কথা বলা হলো প্রাচীন ব্যবস্থাদি সম্পর্কেও সেই কথা বলা চলে। উৎসব, ধর্মচর্চা, ব্রত শিকার, কৃষি, যজ্ঞ, পঞ্চায়েৎ ইত্যাদি যে সকল ব্যবস্থা দেখা যায়, সেই স· ব্যবস্থার মধ্যে সর্বব্যক্তির অধিকার ও সহযোগিতা স্বীকৃত। গ্রামীণ-সভ্যতা· এই রীতি—সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ-নীরের মত।

সামাজিকতার ইতিহাস এই স্বাভাবিক পথে অর্থাৎ গ্রামীণ-সংস্কৃতি· রূপে চলে আসছিল। এর মধ্যে মাঝে মাঝে যে-সব অবান্তর উদ্ভব দেখ দিয়েছিল, তারই ধ্বংস আজ আমরা দেখতে পাই উর কিশ ব্যাবিলন আ মহেঞ্জোদাড়োতে।

একটু পরিষ্কার করেই বলা যাক্। সমাজ-বিজ্ঞানের নিয়মে পুঞ্জীভূ· হওয়া এবং কেন্দ্রীভূত হওয়া এই দুই ব্যাপারই অস্বাভাবিক। নগর ব সহরের রূপ একটি কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার রূপ, কয়েক সহস্র বা কয়েক ল· মানুষ নানা জায়গা থেকে এসে একটা সীমা-নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হ· কুটীর, অট্টালিকা ও প্রাসাদ নির্মাণ করে। সঙ্গে সঙ্গে পথ-ঘাট পয়ঃপ্রণা· ইত্যাদি নানা আয়োজনও করতে হয়। এই ভিড়ধর্মী উপনিবেশের সমস্যা · রীতি-নীতি নানা জটিলতায় জড়িয়ে পড়তে থাকে। এর মধ্যে সূর্যালো সভয়ে উঁকি দেয়, বাতাসের প্রবাহ প্রাচীরে প্রাচীরে আহত হয়, গাছে শ্যামলতা ফিকে হয়, ফুলের সৌরভ ও পাখির ডাক দূরে সরে যা আকাশের নীলিমা ধোঁয়ার জালায় অস্পষ্ট হয়। এক সঙ্কুচিত ঠাঁই, সহ সতর্কতা ও ব্যবস্থা দিয়ে ঘেরা ও বাঁধা—তারই মধ্যে কয়েক সহস্র মানু· সংসার-সাধনা চলতে থাকে।

কেন এই অস্বাভাবিকতা? মানুষের সামাজিকতার সূত্রপাত এ

ভাবে হয়নি। একটি গ্রাম, তার নিজের প্রতিভায় ও প্রয়োজনের দাবীতে নিজের জনসংখ্যা বিস্তার করে সহরে পরিণত হয়েছে, এমন প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। গ্রাম থেকে সহর কখনো সৃষ্টি হয়নি। বহু গ্রাম থেকে মানুষ আহরণ করে, বহু গ্রামকে নষ্ট ও জনবিরল করে, বহিরাগত বহু ব্যবস্থাকে একত্রিত করে সহর সৃষ্টি হয়েছে। সহর গ্রামের ক্রমবিকশিত রূপ বা রূপান্তরিত পরিণাম নয়। সহর গুণ-ধর্ম্মে গ্রাম থেকে ভিন্ন জিনিষ। সহরের ইতিহাস খুঁজতে গেলে প্রধানতঃ তিনটি কারণ পাওয়া যায়: (ক) বাণিজ্যিক কারণ, (খ) তীর্থমহিমার কারণ এবং (গ) রাজশক্তির কেন্দ্র হওয়ার কারণ।

এই তিনটি কারণই গ্রামীণ-সভ্যতার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে সহর সৃষ্টি করেছে। এই তিনটি কারণই শ্রেণীবিশেষের স্বার্থবাদের ইঙ্গিত। প্রতি গ্রাম থেকে বাণিজ্যলক্ষ্মীর আসনটি তুলে এক জায়গায় নিয়ে এসে সহর বন্দর গড়া হলো। প্রতি গ্রামের পুণ্যকে ও দেবতাকে ক্ষুদ্র করে দিয়ে বিশেষ একটি স্থান বহু পুণ্য পুঞ্জীভূত করে একটি বেশী মহিমাময় দেবতাকে বসানো হলো—তীর্থভূমি পত্তন হলো। বহু গ্রামের স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীন জীবনযাত্রাকে ছোট করে একটা বিশেষ স্থানে রাজশক্তির আধার ও শাসনের কেন্দ্র খাড়া হলো। এই কেন্দ্রিকতা (Centralisation) নগর-সভ্যতার প্রাণ। এর বিপরীত হলো গ্রামীণ-সভ্যতা।

এইবার বর্তমান যুগের নগর-সভ্যতার প্রসঙ্গে আসা যাক্। বর্তমান নগরগুলির রূপ ও প্রাণের মধ্যে একটি মাত্র তত্ত্ব সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে—ব্যবসায়। ব্যবসাগত সুবিধার খাতিরেই এই নগরগুলির জন্ম। নগরগুলির গঠন ও ব্যবস্থার মধ্যে সর্বতোভাবে এই বাণিজ্যনীতির ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। কোন রাজশক্তির মহিমার জন্য নয়, দেবায়তন বা তীর্থ-ভূমির মহিমার জন্য নয়, এই নগরগুলি গড়ে উঠেছে মাত্র বাণিজ্যিক স্বার্থের জন্য এবং সেই

বণিক্-স্বার্থ কায়েম রাখার উপযুক্ত রাজশাসনের ব্যবস্থার জন্ম। সহর প্রাচীন সহর থেকে রীতি ও প্রকৃতিতে ভিন্নতর। আধুনিক সহ কেন্দ্রিকতার চূড়ান্ত পর্যায় সফল হতে চলেছে। য়ুরোপে শিল্প-বিপ্লবের স যে-ধরণের সহর সৃষ্টি হয়েছে, বর্তমান পৃথিবীর সব সহরগুলি সেই ধরণে ছোট বড় সৃষ্টি। মানুষের স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক বিকাশ ও রূপান্তরের ধা সহরের মধ্যে এসে ভিন্নমুখী হয়ে গেছে। এই ভিন্নমুখীনতা সর্বব্যক্তি হিতার্থে নয়। সহরের সভ্যতায় গ্রামীণ-সংস্কৃতির মূল সত্য অস্বীকৃত এখানে উৎসব, ধর্ম, ক্রীড়া, আমোদ, শিক্ষা, বিচার, নীতিবোধ—সব কিছু একটি নতুন নিয়মে চালিত। এক নতুন মান (standard) ও মাপকা অর্থাৎ ব্যবসায়িক স্বার্থ, ভোগবাদ, বিত্তকৌলীন্যের কাছে সব কিছু বাঁধ মানুষের সংস্কৃতিকে ব্যবসায়িক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে নিয়ন্ত্রিত ও গঠি করা হয়েছে। শিল্পকলা, শিক্ষালয়, হাসপাতাল, আমোদ-ভবন ইত্যা সংস্কৃতিমূলক সমস্ত ব্যবস্থাগুলির গঠন মার্কেটের মত। কারখানা, অফি আদালত, খেলার মাঠ (Sport) ইত্যাদির মধ্যে এই একই পরিদৃশ্য দেখতে পাই। সবার ওপরে বাণিজ্য সত্য, এই তত্ত্বের ওপর আধুনিক সহরে ভিত্তি। সর্বত্র কেন্দ্রিকতার প্রাবল্য ও বাহুল্য। কারখানা নামে পণ উৎপাদনের যে ব্যবস্থা, তার মধ্যে বীভৎস কেন্দ্রিকতার প্রয়াস। কয়েক শত মানুষকে এক জায়গায় একত্রিত করে প্রচণ্ড বেগে অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর পণ্য উৎপাদন—এই হলো কারখানার গঠনতন্ত্র। য়ুরোপে শিল্প-বিপ্লবের সময়ে ও পরে উপনিবেশ-শোষক জাতি ও রাষ্ট্রগুলি নিজদেশে এবং পরদেশে অজস্র পণ্য বিক্রয়ের জন্ম যন্ত্রপাতিকে নতুনভাবে গঠন করে যে ব্যবস্থা করলেন, তারই নাম কারখানা। এই কারখানার গঠনের মধ্যে যে ঐতিহাসিক কারণটি কাজ করেছে, সেটা নিছক মুনাফাবৃত্তি ও লোভ। কল্যাণ-বুদ্ধির দাবীতে কারখানা সৃষ্টি হয়নি।

বৃহৎ যন্ত্র নির্ম্মাণের জন্য বিজ্ঞানীকে ও এঞ্জিনিয়ারকে কে নির্দেশ দিয়েছিল ? পৃথিবীর মানুষ এই নির্দেশ দেয়নি। নতুন এক বণিক্‌শ্রেণী তাদের কারবারের খাঁকতি মেটাবার জন্যই এই কাজ করেছে। পৃথিবীর সাধারণ মানুষ যদি দাবী করে, তবে তারা ছোট ছোট যন্ত্রই দাবী করবে, যে যন্ত্র ঘরে ঘরে তাদের কর্মসহচর হয়ে থাকবে, যার সঙ্গে গৃহপালিত পশুর মত মমতার সম্পর্ক হবে। কিন্তু যন্ত্রকে অতিকায় দানবীর রূপ দিয়েছে সহর-সভ্যতায় পুষ্ট স্বার্থবাদী মানুষের প্রতিভা। গ্রামীণ-সভ্যতায় যন্ত্র সহজভাবে এবং স্বাভাবিকরূপে গৃহীত হতো। কিন্তু সহর-সভ্যতায় যন্ত্র অপ্রাকৃত রূপ গ্রহণ করেছে। এই অপ্রাকৃত অতিকায় যন্ত্র সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে। সাধারণ মানুষ এই অতিকায় যন্ত্রের হৃদয় হাতড়ে পায় না; কারণ, এই যন্ত্র নখরকণ্টকে আবৃত। মানুষ স্বয়ং এই যন্ত্রের খণ্ড খণ্ড অংশরূপে, দাসরূপে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে। নিজেরই জ্ঞানের সন্তানের এই রূপ মানুষ আশা করেনি।

আধুনিক সহরের কোন ব্যবস্থাকেও মানুষ হৃদয়ের সান্নিধ্যে পায় না, হাতড়ে পায় না। আধুনিক সহরের অফিস একটি অতিকায় যন্ত্রস্বরূপ। এর বড় সাহেব প্রস্তর-বিগ্রহের চেয়েও অচল, অনড় ও কেতাদুরস্ত। একটি নির্গুণ ও নির্ব্যক্তিক সিস্টেম বা বিধান আছে, সেই বিধানের মধ্যে মস্তিষ্ক ও হৃদয় ছাড়া আর সবই আছে। মানুষের আচরণ থেকে বিচার ও আবেগ নির্বাসিত করে শুধু হাত-পা নাড়ার সজীবতা নিয়ে থাকাই সহুরে-সভ্যতার লক্ষণ।

আধুনিক সহুরে-সভ্যতার বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় অভিযোগ কি ?

প্রথম অভিযোগ, সহুরে সভ্যতায় মানবিকতা সম্পূর্ণভাবে বিদায় নিতে চলেছে। কিন্তু আমরা জানি সভ্যতার পরম পাথেয় হলো মানবিকতা নামে

সাধনার ঐশ্বর্য। ব্যক্তি-মানব উন্নত হবে, মানুষের অধিকার প্রসারিত হ
সকল জ্ঞান ও শিল্প মানুষের অধিকারে সফল হবে—মানুষের সকল আচর
মধ্যে এই মানবিকতাকেই বজায় রাখার প্রয়াস সব চেয়ে বড় বিষয়। মা
গরু-ঘোড়াকেও মানুষের মত নামকরণ করে। গরু তার কাছে শুধু গ
নয়—সুশীলা, কপিলা শ্যামলী, ধবলী, বুধীরূপে তারা পরিচিত। মা
তার যন্ত্রসহচর ঢেঁকি ও নৌকার গায়ে সিঁদুর লেপন করে। বন, জঙ্গ
পাহাড়, নদীকে নাম দিয়ে সৌহার্দে যুক্ত করে। শিল্পী মানুষ, বরুণ ই
ও অগ্নিরূপী অশরীরী দেবতাকে ভাস্কর্যে শরীরী মানবের রূপে পরিং
করে; দার্শনিকের নির্বস্তুক (abstract) চিন্তার বিষয়কে মানু
মায়ার সঙ্গে মিশিয়ে কাব্য করে তোলে। মুনি বাল্মীকির দেবতা র
তুলসীদাসের হাতে ঘরের ছেলের রূপে মানবিকতা (humanised) ল
করেছেন। গ্রামীণ-সংস্কৃতি মানবিকতা-প্রধান। সহর তার উল্টো।

একটা ছোট উদাহরণ দেওয়া যাক্। কয়েক বছর আগে কলকা
সহরের সমস্ত সার্ভিস মোটরবাসগুলির এক একটা নাম ছিল—'উর্ব
'তিলোত্তমা' 'পথের আলো' ইত্যাদি। আজ দেখতে পাই, সেই নাম নে
তার বদলে নম্বর হয়েছে।

নিশ্চয় কলিকাতাবাসী মানুষের সম্মিলিত দাবীতে মোটরবাসগুলি
এই নাম অর্থাৎ মানবিকতার রংটুকু নিশ্চিহ্ন করা হয়নি। ব্যবসায়ীরা স্ব
তাদের যৌথগত সুবিধার খাতিরে, কারবারে সুবিধার জন্যই নাম তুলে ন
দিয়েছেন। কটু সমালোচকের কল্পনায় তাই এমন একটা ভবিষ্যৎও অস
নয়, যে-দিন কলিকাতাবাসী মানুষেরও নাম উঠে যাবে। নম্বর দিয়েই তা
পরিচয় ঘোষিত হবে। কারণ, তাতে সহরের কাজের অনেক সুবিধা হ
অফিসের কেরাণী-নিয়ন্ত্রণ, মজুর-নিয়ন্ত্রণ, ভোটার-নিয়ন্ত্রণও পরিচাল

উপযুক্ত একটি ফিটফাট খাতা-বাঁধা ব্যবস্থা সম্ভব হবে। এবং কবি রবীন্দ্রনাথের আত্মা আবার নতুন করে আক্ষেপ করে উঠবেন—

"সেদিন কবিত্বহীন বিধাতা একা রইবেন বসে
নীলিমাহীন আকাশে
ব্যক্তিত্বহীন অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নিয়ে।"

ভারতবর্ষের আধুনিক সহর নিছক ভোগীর (consumer's) উপনিবেশ। সেই কারণে ভারতের আধুনিক সহর আরও নিষ্ঠুর। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের যে-ব্যবস্থা, তার সব চেয়ে বড় এক্সিকিউটিভ হলো সহর।

বর্তমান সভ্য মানুষের সমাজ-ব্যবস্থার এই শোচনীয় বিকৃতি সম্মুখে দেখতে পেয়েই সর্বদেশে একটি নতুন চিন্তার উন্মেষ হয়েছে। য়ুরোপীয় চিন্তা থেকে উদ্ভূত বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ বা সোসালিজমের মধ্যে বর্তমান সহরে-সভ্যতাকে বিশ্লেষণ করে তার এই বাণিজ্যসর্বস্ব শোষকরূপ আবিষ্কার করা হয়েছে। য়ুরোপীয় চিন্তাশীলেরা প্রধানতঃ সভ্যতার এই বিকৃত ভ্রান্ত এবং ইতিহাস-ভ্রষ্ট রূপকেই 'বুর্জোয়া' সভ্যতা নামে অভিহিত করেছেন। এই জটিল পীড়াকর অবস্থা থেকে কি ভাবে মুক্ত হওয়া যায় তার নির্দেশও বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের ব্যাখ্যায় পাওয়া যায়। কিন্তু তার পর থেকে মনীষীদের চিন্তা আরও অগ্রসর হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে আরও বহু ঘটনায় নতুন সত্যের পরীক্ষা হয়ে গেছে এবং অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের হৃদয় থেকে একটি নতুন বাণী ধ্বনিত হচ্ছে। এই বাণী ভারতের প্রতিভার বাণী। ভারতের মনীষা সভ্যতার এই বিকৃতিকে রোধ করার জন্য উপায় উদ্ভাবন করেছে। ভারতের মানুষের জীবনে ও মাটিতে সভ্যতার বিকার যে দুঃখের দাহন সৃষ্টি করেছে, তা বোধ হয় অন্য দেশের চেয়ে বেশী। এইখানেই সহরে-সভ্যতার অকল্যাণের আয়োজন চরম-

ভাবে হৃদয়হীন হয়ে উঠেছে। তাই ভারতবর্ষই সমাজ-বিজ্ঞানীর পক্ষে সব চেয়ে বড় পরীক্ষাগার।

বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী—ভারতের চিন্তার প্রতিনিধিস্বরূপ এই সব কর্মযোগী সাধকদের সকল যুক্তি বিচার ও ব্যাখ্যার মধ্যে আমরা একটা ইঙ্গিত দেখতে পাই। সেই ইঙ্গিত গ্রামীণ-সভ্যতার আহ্বান। শুধু এই তিন মনীষী নন, ভারতের বহু গুণী জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের মুখে আজ একটা কথা ধ্বনিত হচ্ছে। নানা ভাষায় ও ভাবে তার প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। 'গ্রামে ফিরে চল' 'গ্রাম-স্বরাজ' 'গ্রাম-উদ্যোগ' 'পল্লী-সংস্কার' 'গ্রাম-শিল্প উন্নয়ন' 'বনিয়াদী শিক্ষা' ইত্যাদি বাণীর মধ্যে আমরা ভারতের ঐতিহাসিক চেতনার সেই বৈপ্লবিক সংঘটন ও রূপান্তরের দাবী শুনতে পাই। এদের মধ্যে কেউ বিষয়টাকে বৈজ্ঞানিক ভাবে ধরেছেন, কেউ সম্পূর্ণ অর্থনীতিক দৃষ্টি নিয়ে সমর্থন করেছেন, কেউ বা শুধু প্রাচীনতার প্রতি নিষ্ঠার জন্য করেছেন এবং অনেকে একটা ধর্মবোধ থেকে করেছেন। যে যে ভাবেই দাবী করুন না কেন, সবার চিন্তার পেছনে সেই ঐতিহাসিক চেতনাই কাজ করছে। এই পল্লী-উন্নয়নের অর্থ মজা দীঘির পঙ্কোদ্ধার নয়, ম্যালেরিয়া দূর করা অথবা চরকার প্রচলন নয়। এই সবই সেই মূল সত্যের প্রতিষ্ঠার দিকে খণ্ড খণ্ড প্রয়াস। এই সাধনা 'ফিরে যাওয়ার' (back to village) সাধনা নয়। বলতে পারি, ঘরে আসা বা home coming।

গ্রামীণ-সংস্কৃতির অর্থ সামাজিকতার স্বাভাবিক উৎকর্ষ। এই সংস্কৃতি প্রধানতঃ মানবিক সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি বিকেন্দ্রীকৃত (decentralised) উৎপাদন-ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই সংস্কৃতি সমাজবাদ বা সাম্যবাদের সহজ আশ্রয় এবং স্বাভাবিক ভিত্তি।

আর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা যাক্। বর্তমানের গ্রামগুলিই কি

গ্রামীণ-সভ্যতার আধার ও বাহন? গ্রামবাসীদের মনোভাব বুদ্ধিবৃত্তি ও রুচির মধ্যে কি গ্রামীণ-সভ্যতার সত্যগুলি বজায় আছে?

না, বর্তমানের গ্রাম গ্রামীণ-সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ মাত্র। গ্রামীণ-সভ্যতার প্যাটার্ন গ্রামের মধ্যেই ভেঙে গেছে। সহরের সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন সভ্যতা। সহুরে-সভ্যতার মধ্যে জাতিগত ঐতিহ্যের কোন প্রকাশ নেই। কলকাতার সভ্যতা এবং লণ্ডনের সভ্যতা প্রকৃতিতে একই। কলিকাতাবাসী নাগরিক ও লণ্ডনবাসী নাগরিকের রুচি নীতি ও [illegible]র মূল কাঠামো একই ফ্রেমে বাঁধানো। কোন সুস্থ আন্তর্জাতিকতার গুণে ও দাবীতে এই সাদৃশ্য সম্ভব হয়নি। জাতিকতা নেই অর্থাৎ স্বাভাবিক ঐতিহাসিক স্বরূপ নেই—মাত্র এই পরিচয়হীনতা ও বৈশিষ্ট্যহীনতার জন্যই সহুরে-সভ্যতাকে 'আন্তর্জাতিক' বলে ভুল করা হয়। সর্বজাতির বুদ্ধি হৃদয় ও প্রতিভার সৃষ্টি এবং পরিচয় কলকাতায় খুঁজে পাওয়া যায়—কলকাতার আন্তর্জাতিকতা এই রকমের নয়। কোন জাতিরই হৃদয়ের ছাপ কলকাতার মধ্যে নেই, এই কারণে কলকাতা সহর 'আন্তর্জাতিক' হয়েছে। ঠিক ব্যাকরণগত ভাষায় বলা উচিত—অজাতিক।

আবার যখন দেখি কংক্রীটের কুঠরিতে বসে সহুরে মানুষ তার ফুলদানীতে কাগজের ফুলগুলির দিকে মুগ্ধভাবে তাকিয়ে রয়েছে, তখন বোঝা যায় যে বেচারা সেই স্বাভাবিক রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধে ভরা গ্রামীণ-সভ্যতার প্রসাদটুকুই পাওয়ার জন্য প্রলুব্ধ হয়ে উঠেছে। তাই যন্ত্রের সাহায্যেই সহুরে মানুষ ঘরের ভেতর কৃত্রিম জ্যোৎস্না, কৃত্রিম ফোয়ারা, কৃত্রিম পাখির ডাক রচনা করে। এক দিকে ব্যারাকসুলভ বাধ্য জীবনের দাবী আর এক দিকে মনের মধ্যে প্রাকৃতিক-সামাজিক আবেদন। এই দ্বন্দ্বের প্রকোপ সহুরে মানুষকে উতলা করেছে।

মাসখানেক আগে সংবাদপত্রে এইরকম একটা খবর বের হয়েছিল;

"সুন্দরবন এলাকায় ধূপখাল নামক একটি খালে জোয়ারের জলের সঙ্গে একটি প্রকাণ্ড তিমি মাছ আসে এবং তীরে উঠে বসে থাকে। ভাঁটার সঙ্গে জল সরে গেলে গ্রামবাসীরা তিমি মাছটিকে দেখতে পায়। গ্রামবাসীরা দলে দলে এসে তিমি মাছের গায়ে তেল সিঁদূর ঢেলে দেয়। পরের দিন আবার জোয়ারের সময় ঢাক বাজিয়ে তিমিকে বিদায় দেয়। জোয়ারের জলের সঙ্গে তিমিটা আবার অদৃশ্য হয়।"

এই ছোট ঘটনার মধ্যে মানব-প্রকৃতির একটা সুস্থ আদর্শগত রূপের আমরা সন্ধান পাই। এই হলো গ্রামীণ-সভ্যতার মনোভাব। এই মানবিক-রোমাণ্টিক শিল্পীসুলভ মনোভাব। তিমি মাছটিকে মেরে তেল বার করে বাজারে বিক্রী করবার স্পৃহা যে কোন গ্রামবাসীর হয়নি, এর মধ্যে আমরা সেই স্বাভাবিক সত্যেরই প্রকাশ দেখতে পাই। গ্রামবাসীর মনেও আজ পর্যন্ত অলক্ষ্যে ও অজ্ঞাতসারে সেই গ্রামীণ-সভ্যতার আবেগটুকু রয়ে গেছে। তার চার দিকে সেই হারানো-স্বর্গের, সেই গ্রামীণ-সভ্যতার ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে আজও একটা চাপা নিশ্বাস গোপনভাবে রয়ে গেছে। আধুনিক যুগের কতগুলি অসামাজিক ও স্বার্থ-সর্বস্ব অর্থনীতির ঝড়ঝঞ্ঝার প্রকোপে, উৎক্ষিপ্ত বালুকার জঞ্জালে গ্রামীণ-সভ্যতার রূপ চাপা পড়ে আছে, তাই আমরা গ্রামকে আজ ধ্বংসস্তূপ বলেই মনে করি। কিন্তু এই জঞ্জাল সরিয়ে ফেললেই সেই গ্রামীণ-সভ্যতার সঙ্ঘারাম আবার দেখা দেবে, আধুনিক যুগের মানুষ নতুন জ্ঞানের আনন্দ দিয়ে সেই সঙ্ঘারামকে সাজাবে। আরও নতুন স্তম্ভ রচিত হবে, আরও নতুন প্রদীপ জ্বালবে, পথহারা পথিক পথ খুঁজে পাবে।

সহরকেও তার এই উর্দিভূষিত অমানবিক ড্রিল-প্যারেডতুরস্ত ব্যারাক-পীড়িত ফ্লাট-সঙ্কুচিত জীবনের প্রাচীর ভেঙে ফেলতে হবে! মানুষের প্রাকৃতিক ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারকে আবার গ্রহণ করতে হবে। ভিড়-

করা জীবনের হাঁপানি থেকে উদ্ধার লাভ করতে হবে। সবার ওপরে মানুষ সত্য—সেই 'হিউম্যান'কে সর্বভাবে আয়ত্ত প্রসারিত ও উন্নত করার সাধনাই সামাজিক সভ্য মানুষের সাধনা। নইলে গ্রাম এবং সহর নামে দুটি ভিন্ন প্রকৃতির জীবনের প্যাটার্ণ মানুষজাতিকেই ভিন্ন করে রাখবে। দূর ভবিষ্যতে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধের কারণ মিটে গেলেও, সহর ও গ্রাম নামে দুই পরস্পরবিরোধী রুচি, বৃত্তি ও স্বার্থের অধিকারী দু' শ্রেণীর জনতার মধ্যে হিংস্র সংগ্রামের আশঙ্কাও অমূলক নয়।

গ্রামীণ-সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে সামাজিক হৃদয়ের প্যাটার্ণ, নাগরিক সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে বৈষয়িক উপকরণ। প্রথমটিকে বালুকাস্তরণ সরিয়ে পুনরাবিষ্কার ও উদ্ধার করতে হবে। দ্বিতীয়কে প্রাচীরের বন্ধন ভেঙে মুক্ত করে ছড়িয়ে দিতে হবে। এর ফলে আমাদের লাভ হবে এমন একটি সংসারের রূপ, যা আধুনিক সহরও নয় এবং আধুনিক গ্রামও নয়।

যদি তা না হয়, তা'হলে হাজার বছর পরে আর একজন অরেল ষ্টাইন এসে কলকাতা সহরের ধ্বংসস্তূপের কাছে দাঁড়াবেন। আবার তাঁকে লিখতে হবে—"এই জনপদকে আজ প্রেতলোকের একটি ভগ্নাংশ বলে মাঝে মাঝে ভয় হয়।" আজকের দিনে আমরা ভুল করে এই মানবতাহীন সহরগুলির মধ্যে প্রেতলোকের ভূমিকা রচনা করে চলেছি। কলকাতার জনারণ্য সত্যি-কারের অরণ্যের মতই। মানুষ এখানে নিছক উপকরণ হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।

সুখের বিষয়, ভারতীয় মনীষীদের মধ্যেই সমাজবিজ্ঞানের এই তত্ত্বটি আজ সমূহভাবে ধরা পড়েছে। পশ্চিমের পণ্ডিতীয়ানার মধ্যে বিষয়টি এখনো ততটা গ্রাহ্য হয়নি। মাত্র সূচনা হয়েছে। পশ্চিমী চিন্তার মধ্যে এখনো Form ও Content-এর সংজ্ঞা সুস্থির হয়নি। ফর্মের রূপ এক ধরণের এবং কনটেণ্টের রূপ আর এক ধরণের, একই ব্যবস্থায় নাকি এই দ্বয়ী সত্তা সম্ভব

হতে পারে। ভারতবর্ষের আধুনিকতম চিন্তা আরও অগ্রসর হয়ে সমাজ-বিজ্ঞানের গভীরতর সত্যটিকে ধরতে পেরেছে। বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের সামঞ্জস্য—ভারতীয় চিন্তার এই বাণী।

পশ্চিমী চিন্তার রীতি কতকটা এই ধরণের—আধুনিক কারখানার ফর্ম বা গঠন এইরকমই থাকুক, আধুনিক ইউনিভার্সিটীর ফর্ম এই-ভাবেই থাকুক, আধুনিক সহরের গঠন এই কাঠামোতেই আবদ্ধ থাকুক,—শুধু এই ব্যবস্থাগুলির ওপর সর্বসাধারণের অধিকারকে সফল করে দিতে হবে। তা'হলেই সমাজবাদ সফল হবে।

আধুনিক ভারতীয় চিন্তায় আরও বৈপ্লবিক নীতি ধ্বনিত হয়েছে ; ঐ ফর্মেরও পরিবর্তন ও ভাঙন চাই। কারখানার ফর্মও শোষণব্যবস্থার উপযোগী। তরবারি হত্যা করার জন্যই, সাধু মানুষের হাতে বা একটী সাধুসঙ্ঘের হাতে ঐ তরবারির স্বত্ব সঁপে দিলেই সে তরবারি দিয়ে মাটি চাষ করবে না। অত্যধিক মুনাফা ভোগ করার জন্য, মজুরকে ঠকিয়ে অমানব করে অল্প সময়ে প্রচুর পণ্য উৎপাদনের জন্যই কারখানা নামে একটি সংস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। কারখানার যন্ত্রের দাঁত, নখ, গর্জন, বেগ—সবই ঐ মূল উদ্দেশ্যের উপযোগী করে তৈরী। কারখানার ওপর সাধারণের অধিকার সত্য করে দিলেই সমস্যা চুকে যায় না। কারখানার ঐ গঠনকেই ভেঙে দিয়ে নূতন রকমের দিতে হবে। 'স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু' সকল বুদ্ধিজ কীর্তির সঙ্গে কল্যাণভাব যুক্ত হওয়া চাই। অর্থাৎ কোন্ ধরণের কারখানা, কোন্ ধরণের জনপদ, সামাজিক মানুষের মানবিকতাকে সহজ সার্থক ও উন্নত করবে—সমাজবিজ্ঞানীর কাছে এটাই প্রথম প্রশ্ন। এর সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় প্রশ্ন দেখা দেয়—কোন্ উপায়ে সর্বমানুষের জন্য সমান অধিকারের ব্যবস্থা সফল করা যায়? বিষবৃক্ষের ফলগুলিকে সমানভাবে

মানুষের মধ্যে ভাগ করে দিলেই 'সাম্য' হয় না। সেটা নিম্নস্তরের সাধনা।

আধুনিক ভারতীয় চিন্তার ধারা যাঁরা লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা এই ঐতিহাসিক তত্ত্বটির তাৎপর্য বুঝতে পেরেছেন। ভারতবর্ষের এই নতুন বাণীর মধ্যে পৃথিবীর বিভ্রান্ত চিন্তা একটা শান্ত আশ্রয় লাভ করতে চলেছে। আমরা ভারতীয়েরা তাই অরেল ষ্টাইনের মত হতাশায় শুধু আক্ষেপ করি না। আমরা বিশ্বাস করি—'চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদু মৃদুম্বরম্।' এগিয়ে চলাই হলো অমৃতলাভ, এগিয়ে চলাই তার স্বাদু ফল। প্রচণ্ড বেগে ঘুরপাক খাওয়া একটা অস্থিরতার কীর্তি মাত্র, কিন্তু এই অস্থিরতা এগিয়ে চলা নয়।

আজকের দিনে সমস্যা জটিল ও কঠিন। বাধা প্রচুর। কিন্তু এই নিরাশার বিষণ্ণতাই আজ একমাত্র ব্যাপ্ত দৃশ্য নয়। ভারতবর্ষের মাটিতেই গ্রামীণ-সভ্যতার অভ্যুত্থানের একটি সুর শোনা যাচ্ছে। গ্রামীণ-সভ্যতা আজও সাত লাখ গ্রামের জীর্ণ পাঁজরের আড়ালে স্পন্দিত হচ্ছে। তাকে নতুন নিশ্বাসে ভরে দেওয়াই আজকের দিনের সাধনা। সুতরাং আমাদের চোখের সামনে ধ্বংসস্তূপের দৃশ্যটাই বড় হয়ে ওঠে না। দুঃখিত অরেল ষ্টাইনকে আমরা ডেকে আনতে পারি, আর একটি দৃশ্য দেখতে। শান্ত মনে, শ্রদ্ধার সঙ্গে, শুভ বুদ্ধির প্রেরণায়, ধীরে ধীরে এক একটি পাথরের সিঁড়ি পার হয়ে আর একটা পরিত্যক্ত প্রাচীন উপনিবেশের শিলাময় হৃদয়ে প্রবেশ করি—ভারতভূমির বক্ষোলগ্ন এই এলিফ্যান্টা পাহাড়। এক বিরাট পাষাণের মূর্তির কাছে এসে দাঁড়াই। ত্র্যম্বক সদাশিব মূর্তি। আমরা বার বার গ্রামীণ-ভারতের অজ্ঞাতনামা শিল্পীর এই বিরাট সৃষ্টির দিকে বিস্ময়ভরে তাকিয়ে থাকি। "আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে"—সত্যিই শিল্পসাধনার দ্বারা বিশ্বের দেবশিল্পের ছন্দে শিল্পী আপনাকে ছন্দোময় করে তুলেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির, ভারতের

গ্রামীণ সংস্কৃতির এই স্বরূপ আমরা তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করি। তখন আমরা আর অরেল ষ্টাইনের মত শোকাচ্ছন্ন হই না। গ্রামীণ-ভারতের সেই শিল্পীর হৃদয়টিকে আমরা চিনতে পারি। আমরা অনুভব করি, যেন জাগ্রত প্রহরীর মত সর্ব অকল্যাণের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য ত্র্যম্বক সদাশিব তাকিয়ে আছেন আরব সমুদ্র ছাড়িয়ে দিগন্ত পর্যন্ত। গ্রামীণ-ভারতের সত্যিকারের 'গেট-অব-ইণ্ডিয়া' এইখানে। আমরা উপলব্ধি করি, ধ্বংস-স্তূপের ওপর আমরা আর দাঁড়িয়ে নেই। স্বরাট্ গ্রামীণ-ভারতের তোরণদ্বারে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি।

ফিরে চল মাটির টানে

জীবন মাটী হয়ে যাবে! নিতান্ত আক্ষেপের সুরে আমরা কথাগুলি বলে থাকি।

কিন্তু আমরা কি জানি না যে, এই জীবন তো মাটী থেকেই পাওয়া? জীবন মাটী হয়ে গেল! মাটীর প্রাপ্য মাটীকেই ফিরিয়ে দেওয়া হলো। এর মধ্যে দুঃখটা নিতান্ত অবান্তর ও অবাস্তব নয় কি?

তবু এই অবাস্তব দুঃখেই আমাদের চেতনা আবিল হয়ে আছে। জীবনকে ও মাটীকে চিনতে কোথাও নিশ্চয় আমাদের ভুল হয়েছে, যার জন্য আমাদের এই অহেতুক আক্ষেপ।

অনেক পণ্ডিতকেও রীতিমত দুঃখ করতে দেখা যায়। কৃষিগত সভ্যতার 'বর্বরতা' ও 'আদিমতা' থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তাঁরা ছট্‌ফট্‌ করেন। প্রাচীন মাটীর সঙ্গে সম্পর্কটা অস্বীকার করতে পারলেই যেন 'উপরে' উঠতে পারা যাবে। সুতরাং কৃষির চেয়ে ইণ্ডাষ্ট্রী বড়। মানুষের জীবন মাটীর তোয়াক্কা করবে না, এ এক মস্ত বড় গর্ব।

অনেকে আবার একটু রয়ে সয়ে কথা বলেন। তাঁদের দাবী যন্ত্রোপেত কৃষি (Mechanised Agriculture)। এই কথাটাও শুনতে অদ্ভুত— 'ভয়ানক ভয়ের' মত অথবা 'সরস রসের' মত।

এগ্রিকাল্‌চার চিরদিনই যন্ত্রোপেত। লাঙ্গলের ফলা বা ট্র্যাক্টর উভয়ই যন্ত্র। যন্ত্ররূপী এই বস্তুগুলিই সভ্যতার ক্ষেত্রে বড় সম্পদ্ নয়। বড় আবিষ্কার ও গৌরব হলো—মানুষের শ্রমকৌশল বা দক্ষতা বা বুদ্ধিচালিত পরিশ্রম।

সুতরাং এমন ব্যাপার অসম্ভব নয় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে লাঙ্গলের শ্রমের পেছনে প্রকৃত সভ্যবুদ্ধি কাজ করছে এবং ট্রাক্টরের পেছনেই হয়তো রয়েছে নিছক মূর্খশ্রম।

অর্থাৎ প্রশ্নটা হলো চেতনার প্রশ্ন, কোন কাজ বা বিষয় সম্বন্ধে সমূহ

জ্ঞান ও প্রেরণা থাকার প্রশ্ন। সভ্যতার উৎকর্ষনির্ণয়ের বিচারে এই 'চেতনার' রূপটাই একমাত্র মাপকাঠি, বস্তুগুলি নয়।

মাটীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের এই মৌলিক প্রাকৃতিক এবং বাস্তবিক যোগটুকু বিস্মৃত হওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু অস্বাভাবিক মনে অস্বাভাবিকতাই প্রকৃত স্বাভাবিকতা। চড়া মেজাজের প্রগতিবাদীরা একেবারে সোজাসুজি বিশ্বাস করেন যে, 'মাটি ছাড়া' ইণ্ডাষ্ট্রীই উন্নতির চরম। জীবিকার জন্য মাটির ওপর নির্ভর করে থাকাই নাকি একটা অসভ্যসুলভ পরাধীনতা।

মাটির বনিয়াদকে এইভাবে তুচ্ছ করার মধ্যে যেন একটা দম্ভ ও অভিমান আছে। ঠিক যেমন রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কুষ্মাণ্ডের মনে মনে বড় অভিমান। তার বাঁশের মাচাটি নাকি পুষ্পক বিমান। মাটীর সঙ্গে তার নাকি কোন সম্পর্ক নেই, সে একটি খাঁটী স্বর্গীয় বস্তু।

মাটীকে তুচ্ছ করার এই কুষ্মাণ্ড কমপ্লেক্স মানুষের সংস্কৃতিকে নানা-ভাবে বিপন্ন ও ব্যাহত করেছে। সব চেয়ে দুঃখের বিষয় বৈজ্ঞানিকতার নামে, প্রগতির নামে ও আধুনিকতার নামেই এই ভ্রান্তি পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে সভ্যতার ছন্দ নষ্ট করছে। আমাদের দেশেও এক শ্রেণীর পণ্ডিত (!) হুবহু য়ুরোপীয় চিন্তার আশী বছর আগেকার ভুলগুলিকে জোর গলায় প্রতিধ্বনিত করে নিজেদের আধুনিকতার বড়াই করে থাকেন।

সুখের বিষয় আধুনিক য়ুরোপের চিন্তাশীলেরা ধীরে ধীরে তাঁদের পুরাতন ভুলের স্বরূপটা চিনতে পারছেন। মানুষের ইতিহাসকে কোথায় অপমান করা হয়েছে, সভ্যতার পরিক্রমায় কোথায় মানুষের পদক্ষেপ পথের বাইরে সরে গেছে, কোথায় স্বভাবের বিকার হয়েছে—বহু দুঃখের পরীক্ষায় আজ তাঁরা প্রাক্তন স্খলন পতন ও ত্রুটীগুলিকে ধরতে পারছেন।

সব চেয়ে বড় গর্বের বিষয়, ভারতবর্ষের মনীষা এই ত্রুটীগুলিকে অনেক

দিন আগেই ধরতে পেরেছিল। য়ুরোপের সর্বাধুনিক প্ল্যানার আজ যে সংগঠনের স্বপ্ন নিয়ে তার জাতি ও সমাজকে নতুন করে গড়তে চাইছে, তার পরিচয় যদি আমরা পেতাম, তা'হলে বুঝতে পারতাম যে, পৃথিবীর চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের আধুনিক ভারতবর্ষ এখনো তার অগ্রবর্তিতা হারায়নি। আজ ভারতবর্ষ যা ভাবে, য়ুরোপ কাল তাই ভাবে—এইরকম একটা ব্যাপার চারদিকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। ভারতবর্ষের মাটীর নীচে সুড়ঙ্গ-রেল নেই, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ভারতীয় চিন্তায় বৈজ্ঞানিকতার অভাব আছে। য়ুরোপ ও আমেরিকার বহু লক্ষ গবেট দিন-রাত্রি কলের গাড়ী চড়ে বেড়ায়, কিন্তু মন বুদ্ধি রুচি ও দৃষ্টিতে তারা জংলীদের চেয়েও বেশী বৈজ্ঞানিক এমন কোন প্রমাণ নেই। পরের মুখে বিস্তার ঝাল খাওয়ার ফলে আমাদের দেশের ইংরেজী বৃত্তিভোগী শিল্পী বৈজ্ঞানিক ইকনমিষ্ট ও শিক্ষাশাস্ত্রীদের বিচার সব চেয়ে জটিল হয়ে উঠেছে এইখানে; য়ুরোপীয়েরা যাকে ইণ্ডাষ্ট্রী বলেন এঁরাও তাকে ইণ্ডাষ্ট্রী বলেন। য়ুরোপীয়েরা যাকে বৈজ্ঞানিকতা বলেন, যাকে আধুনিকতা বলেন, যাকে 'প্রগ্রেস' বলেন—এঁরাও সেই সব সংজ্ঞাই মেনে নিয়েছেন। এবং যত রয়াল কমিশনের দল আমাদের সংসার তদন্ত করে আমাদের ঘাড়ে তাঁদের বুদ্ধির বোঝা ও ব্যবস্থা চাপিয়ে দিতে চাইছেন।

অথচ মজার ব্যাপার হলো, এই সব রয়াল বৈদ্যের দল আমাদের যে রোগের জন্য লম্বা লম্বা ব্যবস্থাপত্র দিচ্ছেন, তাঁরা নিজেরাই সে-রোগে ভুগছেন। সম্প্রতি যুদ্ধোত্তর ইংলণ্ডের সংগঠন-পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। এই পরিকল্পনার মধ্যে নিন্দে করার মত বিষয় খুব কমই আছে। বরং আমরা খুসী হই যে, বহু ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টাই এই পরিকল্পনার মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে।

এই পরিকল্পনার মধ্যে মাটীর প্রশ্নই বড় প্রশ্ন। শুনতে আশ্চর্য

লাগবে—য়ুরোপের একটা বনেদী ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল দেশ, কল্‌কারখানার গর্বে যারা আত্মহারা হয়েছিল, তারা কেন আবার মাটীর দিকে ঝুঁকে পড়ছে? সে দেশে তো গান্ধীর মত মাটীওয়ালা আদ্‌মি নেই, রবীন্দ্রনাথের মত কবি নেই—যিনি শুধু গ্রামের রাঙা মাটীর পথে নিজের মনকে ভুলিয়ে বেড়াতে ভালবাসেন!

বর্তমান নিবন্ধে আমরা ইংলণ্ডের জাতিগঠনের আধুনিকতম পরিকল্পনার মূলনীতিগুলি বিবৃত করবো। তার সঙ্গে ভারতের জাতীয় সংগঠনের পরিকল্পনার মূলনীতিগুলির তুলনামূলক বিচার করবো। সেই সঙ্গে এইটুকু শুধু বুঝতে চেষ্টা করবো যে, মাটীর টানে যদি ফিরে চলে যাই, তা'হলে কি শুধু ফিরে যাওয়াই সার হবে? কিম্বা আর কাউকে ফিরে পাব? মাটীতে ফিরে গিয়ে কি জীবনকে সত্যিই ফিরে পাওয়া যাবে?

১৯৪৩ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে ইংলণ্ডে একটি নতুন বিভাগ সৃষ্টি হয় এবং একজন মন্ত্রীর অধীনে এর পরিচালনার ভার ন্যস্ত করা হয়। এই বিভাগের নাম—The Ministry of Town and Country Planning—জাতিকে নতুনভাবে সংগঠনের জন্য যুদ্ধের মধ্যেই সমগ্র জাতির চিন্তা কতখানি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে চলেছিল এবং কী ব্যাপক ও বিরাট পরিকল্পনা তৈরী করেছিল তার একটুখানি আভাস দেওয়া গেল; ১৯৪৪ সালে ২রা মার্চ তারিখে মিঃ মরিসন কমন্স সভায় বক্তৃতাক্রমে বলেন—"বর্তমানে নিযুক্ত ১৩৯৬ জন প্ল্যানিং বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ৮৬২ জন অভিজ্ঞ ও বিষয়-বিশারদ ব্যক্তি ১৫৮টি কার্যকরী কমিটির মারফৎ তাঁদের পরিকল্পনা তৈরী করে চলেছেন।"

উক্ত টাউন এণ্ড কান্ট্রি প্ল্যানিংয়ের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পার্লামেণ্ট এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন—"Securing consistency and continuity in the

framing and execution of a national policy with respect to the use and development of land throughout England and Wales."

জমি সম্বন্ধে জাতীয় নীতি নির্ধারণ এই বিভাগের উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্য নিয়েই গবেষণার কাজ অগ্রসর হয়। প্রধানতঃ নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ে বিশদভাবে পর্যালোচনা হয় :—

(১) জমির প্রাকৃতিক বনিয়াদ, বর্তমান ব্যবহার এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা।

(২) জনসন্নিবেশ (distribution of population), জীবিকাগত প্রয়োজন এবং জনসাধারণের সমুন্নতি।

(৩) সহরের গঠন। ঘরবাড়ী ও পথের উচিত সংস্থান ও ব্যবস্থা।

পল্লী-ইংলণ্ড রক্ষা কাউন্সিলের (Council for the Preservation of Rural England) সভায় মিঃ মরিসন সরকারী নীতি ঘোষণা করে বলেন : "...We mean to guard jealously the country's farmland, especially the limited and precious extent of farmland of high quality; that, on the other hand, we mean to preserve no less jealously the country's rural amenities."

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মিঃ হাডসন (Minister of Agriculture) কমন্স সভায় যুদ্ধোত্তর সরকারী নীতির ঘোষণা করেন।

"In future, it is hoped that the claims of agriculture will be accorded equal recognition with those of other vital national interests. The Government has already announced that rural development will be promoted in the light of a positive policy for a healthy and well-balanced agriculture."

ইংলণ্ডের এই "গ্রামোদ্যোগ" এবং পুনর্গঠনের প্রচেষ্টার পেছনে আর একটু ইতিহাস আছে। বহুদিন থেকেই ইংলণ্ডের কারখানা-সঙ্কুল সহুরে জীবনের নানা বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বহু চিন্তাশীলের মন ব্যস্ত হয়েছিল। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, কোথায় যেন একটা গলদ রয়ে গেছে। মানুষের সংসারের সুস্থ রূপ আধুনিক সহরের মধ্যে প্রকাশ লাভ করেনি। এ সহর অস্বাভাবিক। কারখানার এই গঠন অস্বাভাবিক। এই ঘন জনবসতি অস্বাভাবিক।

বর্তমান যুদ্ধের ঠিক আগে দশ বছরের মধ্যে ইংলণ্ডে মোটর গাড়ীর উপদ্রবে ২০ লক্ষ পথিক হতাহত হয়েছে। এই বিপত্তির মূল কারণ বর্তমান সহরের গঠন। এই কারণেই ইংলণ্ডের বিশেষজ্ঞ প্ল্যানার স্পষ্ট রায় দিয়েছেন: "The town-plan may have a thousand virtues, but on the very highest level it has failed."—H. Alker Tripp, Asst. Commissioner, Metropolitan Police.

এই গ্লানি থেকে কি করে উদ্ধার পাওয়া যায় তার জন্য তিনটি কমিটি এর পূর্বেই গবেষণা আরম্ভ করেছিল। এর মধ্যে সর্বপ্রথম এবং সব চেয়ে বিখ্যাত হলো—১৯৪০ সালের বারলো কমিশন (Barlow Commission)। রূপহীন ও মাত্রাহীন ইণ্ডাষ্ট্রিকে সহজ সরল ও স্বাভাবিক করার জন্য বারলো কমিশন এই নীতি ঘোষণা করলেন—'Redevelopment, decentralisation and dispersal.'

অর্থাৎ ইণ্ডাষ্ট্রির রূপকে ও সহরের গঠনকে নতুন করে সাজাতে হবে, বিকেন্দ্রীকরণ সফল করতে হবে এবং ঘনসন্নিবেশের বদলে জনতার বসতিকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে।

এর পর আবির্ভূত হলো ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে স্কট রিপোর্ট

(Scott Report)। জমি এবং পল্লী-উন্নয়ন এই কমিটির প্রধান লক্ষ্য ("All land should be planned nationally and locally")।

তৃতীয়টি হলো ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের উটওয়াট রিপোর্ট (Uthwatt Report)। জমির শ্রেষ্ঠ ও সার্থক ব্যবহারের জন্য নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন ইত্যাদি ব্যাপার সম্বন্ধে এই রিপোর্ট।

"To consider possible means of stabilising the value of land required for development or redevelopment."

এই বারলো, স্কট এবং উটওয়াট রিপোর্ট ইংলণ্ডের চিন্তায় এক নতুন সুর এনেছে। তার পরেও ইংলণ্ডের যেটুকু সহরে গোঁড়ামি ছিল, হিটলারের বোমা সেটুকুও ভালভাবে ভেঙে দিয়েছে, তাই আজ তার যুদ্ধোত্তর প্রয়াসের মধ্যে সহরকে নতুন করে গড়বার, গ্রামকে উন্নত করবার, মাটীর মর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে ছন্দ ও সৌষ্ঠবের সামঞ্জস্য রাখবার প্রবল আগ্রহ দেখা দিয়েছে।

তাই আমরা শুনতে পাই: "Hitler has at least brought us to our senses. We the British Public, have suddenly seen our cities as they are! After experiencing the shock of familiar building disembowelled before our eyes—like an all too real sur-realism—we find the cleared and cleaned-up spaces a relief. These open spaces begin to ventilate the congestion of our imaginations."—Max Lock (Town Planning Consultant to Middlesbrough Bourough Council).

মিনিষ্ট্রি অব্ টাউন এণ্ড কাণ্ট্রি প্ল্যানিংয়ের ১নং সার্কুলারে বলা হয়েছে—"The war has shown the importance of agriculture

in the life of the nation and it is essential that careful consideration should be given to the effect of planning proposals on agriculture."

আর একটি সার্কুলারে বলা হয়েছে—"সহর ও গ্রামের ঘরবাড়ীর স্থাপত্যের কলাগত দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তার মধ্যে কুরুচি অথবা রুচিহীনতা প্রবেশ না করে।"

ইংলণ্ডের এই বিরাট পরিকল্পনার মধ্যে খুঁটিনাটি সর্ব বিষয় আলোচিত হয়েছে। ইংলণ্ডের খনি অঞ্চল ও কারখানা অঞ্চলের চেহারার মধ্যে তাঁরা নিজেদের হঠকারিতার ভুল আবিষ্কার করতে পেরেছেন। লুঠেরা দস্যুর মত ধনিকেরা দেশের মাটীর পাঁজরগুলি এলোমেলোভাবে ভেঙে নোংরামি ছড়িয়ে রেখেছে। কারখানার ক্লিষ্ট মূর্তি আর ধোঁয়া যেন আকাশের স্বচ্ছতাকে ব্যঙ্গ করছে। একটি ছোট অরণ্যকে উচ্ছেদ করে হয়তো সেখানে ট্যানারী বসানো হয়েছে। কারণ চাম্‌ড়ার বাজার-দর আছে, বনের শ্যামলতার কোন বাজার-দর নেই। এই বাজার-দরকে বড় করে দেখার ভুল তাঁরা আজ দেখতে পেয়েছেন। এখন তাঁরা মনে করেন সব চেয়ে বড় দর হলো জাতির দর। এক খণ্ড বনের শ্যামলতার মূল্য কতখানি, সে সম্বন্ধে বাজারের চেয়ে জাতির দিকে তাকিয়েই তাঁরা যেন আজ সত্য কথাটা বুঝতে পারছেন। নিসর্গের সঙ্গে যেন এই সভ্যতার একটা বিরোধ ছিল—কেউ কারও সঙ্গে খাপ খাচ্ছিল না।

ইংলণ্ডের আধুনিক প্ল্যানার এই বিরোধ ঘুচিয়ে দিতে চান: "it (Industry) presents an interesting story of the development of ugliness in the countryside and suggests how careful planning in the future may turn a disadvantage into an

advantage."—G. A. Gallicoe, President of the Institute of Landscape Architects.

ইংলণ্ডের আধুনিকতম ভাবনার ও সাধনার মূল সুরটুকু জানবার মত অনেকগুলি কথা উদ্ধৃত করা হলো। এই মূল সুর হলো—"Right use of land।" প্রভূত ধন-জন-যন্ত্রের অহংকারে ইংলণ্ড যেন এত দিন মাটীর দিকে তাকিয়ে চলতে পারেনি। আজ বুঝতে পেরেছে, কোথায় ভুল হয়েছে। সেই অবহেলিত মাটীকে আবার নতুন করে মর্যাদা দেবার জন্যই যেন এত বড় পরিকল্পনাটি রচনা করা হয়েছে।

অধুনা আমাদের দেশেও মাটীকে যেভাবে অপমান করা হয়েছে, সংক্ষেপে তার একটি তালিকা দিতে পারা যায়:—

(১) সহর নামে ঘন-বসতি-বহুল জনপদ স্থাপন।

(২) যেখানে সেখানে ঘরবাড়ী তৈয়ারী (indiscriminate housing)।

(৩) অত্যন্ত রূঢ়তা ও কুরুচির সঙ্গে খনির কাজ করা। খনি অঞ্চলের চেহারা ধ্বংসস্তূপের মত।

(৪) মাটীকে যথেচ্ছা বনহীন করা (Deforestation)।

(৫) রেল-লাইন স্থাপনের জন্য মাটীর ওপর যথেচ্ছা উঁচু বাঁধ ও পথ তৈরী করা। মাটীর শিরা উপশিরার মত নদী-নালার স্বাচ্ছন্দ্য রুদ্ধ হয়েছে।

(৬) যেখানে সেখানে যথেচ্ছা কারখানা তৈরী করা। নদীর ধারে এবং পাহাড়ের ঢালুতে অতি উর্বর ভূমির ওপরেও কারখানা তৈয়ার হয়ে থাকে।

(৭) কলের লাঙল বা ট্র্যাক্টর দিয়ে মাটীর উর্বরতার আশ্রয় প্রথম পলিস্তরটিকে অযথা ছিন্নভিন্ন করা হয়ে থাকে। মাটীর আয়ু নষ্ট করা হয়।

(৮) রাসায়নিক সার দিয়ে মাটীর উর্বরতার প্রাণ 'humus content' বা জীবাণু-অধ্যুষিত স্তরটিকে পুড়িয়ে ফেলা হয়ে থাকে।

(৯) মাটীর প্রাকৃতিক পট (landscape) ও তার সৌন্দর্য্যের দিকে লক্ষ্য না রেখেই ঘর-বাড়ী কারখানা রচনা হয়ে থাকে। উদাহরণ : কারখানার নোংরামিতে গঙ্গাতটের সৌন্দর্য ও মাটীর উর্বরতার মূল্যকে নানাভাবে অবজ্ঞা করা হয়েছে।

(১০) উপেক্ষার বশে গোজাতির অবনতি সাধন। (মাটীর সার্থকতা কৃষিতে। মাটী ও কৃষির মধ্যে যোগসূত্ররূপে রয়েছে [illegible] তৈরী কোটী কোটী জীবন্ত ট্রাক্‌টর, শক্তির আধার)

এই দশটি অপরাধের তালিকার দিকে তাকালেই বুঝতে দেরী হয় না যে, যন্ত্রগত ইণ্ডাষ্ট্রির প্রতিষ্ঠা ও সম্মান দিতে গিয়েই মাটীর প্রতি এই কয়টি অসম্মান আমরা করেছি। এইখানেই প্রথম কুষ্মাণ্ড কম্‌প্লেক্সের আবির্ভাব —মাটীর সঙ্গে সম্পর্কের সত্যটাকে অস্বীকার। ইণ্ডাষ্ট্রি মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়, মূল অধ্যায় নয়। ভবিষ্যতে হয়তো তৃতীয় বা চতুর্থ অধ্যায়ও আসবে। কিন্তু সেইজন্য মূল অধ্যায়ের মৌলিক বনিয়াদ মিথ্যা হয়ে যাবে না। তবু আশ্চর্যের বিষয় এই যে মাত্র দ্বিতীয় অধ্যায়ে পৌঁছে হঠাৎ যেন আমরা মূল অধ্যায়টি ভুলে গেলাম।

ইণ্ডাষ্ট্রিবাদী মেশিনওয়ালা বেণিয়া ও ইকনমিষ্ট মনে করে বসলেন— ট্র্যাক্টরই ফসল ফলায়, মাটী নয়, অর্থাৎ চোখের চেয়ে চশ্‌মাই বড়।

কে না জানে যে, ভারতের মাটীর আজ প্রয়োজন হলো সেচ ব্যবস্থা (Irrigation), এবং যানবাহনের জন্য নতুন খাল এবং নদীনালার উন্নতি ? তবু অবাধে রেলওয়ের প্রতিষ্ঠা হয়ে চলেছে। 'রেল' নিশ্চয় প্রগতির লক্ষণ, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই 'প্রগতি' বার্মিংহামের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই হয়েছে, ভারতের মাটীর প্রয়োজনের জন্য নয়। কেননা, বার্মিং-

হামের ইস্পাতের পণ্য ভারতে কাটতি করাতে হবে। ভারতের রেল বার্মিংহামের প্রগতির চিহ্ন, কিন্তু ভারতের অধোগতির প্রতীক।

এ কথাও কি আমাদের জানা নেই, গত মহাযুদ্ধের পর ইংলণ্ডের ভাণ্ডারে লক্ষ লক্ষ টন বিস্ফোরকের যে মালমসলা মজুদ ছিল, তারই কাটতি ঘটাবার জন্য ইংরাজ বণিকেরা ভারতের মাটীতে কেমিক্যাল সারের প্রগতি-বাদ প্রচার করলেন? কোন বস্তুর 'প্রগতি' বা 'দুর্গতি' জায়গা বুঝে সত্য হয়। জাহাজ জলের ওপর 'প্রগতি', কিন্তু মাটীর ওপর সেটা নিতান্তই দুর্গতি। এ সব খুবই সহজ কথা, কিন্তু তবু বুঝতে এত দেরী হয় এটাই আশ্চর্য।

ভারতের পুঁজিবাদীদের বোম্বাই প্ল্যান এই কুষ্মাণ্ড অভিমানের একটি চমৎকার নিদর্শন। ভারতের মত কৃষিপ্রাণ দেশের মাটীর দাবীটুকু তাঁদের চোখে পড়েনি। এগ্রিকাল্‌চারের চেয়ে ইণ্ডাষ্ট্রিকেই তাঁরা বড় করতে চান। ইংলণ্ড ও আমেরিকার যন্ত্রপাতির এঁটোকাঁটা কুড়িয়ে এনে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক প্রগতি আনতে চান। এতে বিশেষ আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বড় সাহেব এবং ছোট বাবুদের মনোবৃত্তির মধ্যে এই তারতম্য আছেই। ভারতবর্ষের গ্রীষ্মে বড় সাহেবেরা গলাখোলা সার্ট গায়ে দেন, কিন্তু ছোট বাবুরা গলায় টাই বেঁধে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে সাহেব সাজেন। চাকরের কাল্‌চার এই রকম অর্থহীন ও নির্লজ্জ হয়েই থাকে।

ভারতের প্রগতিবাদী ইকনমিষ্ট ও বৈজ্ঞানিক যখন বুড়ো গান্ধীর গ্রাম-উদ্যোগ ও মাটীর কাল্‌চারের আদর্শের দিকে তাকিয়ে চোখা-চোখা নিন্দার বুলি কপচান, তখন বুঝতে দেরী হয় না যে, এ সবই ঐ সাহেব সাজবার একটা চাকরসুলভ মনোভাব যার মধ্যে প্রগতি নেই, ইকনমিক্‌স্‌ নেই এবং বৈজ্ঞানিকতাও নেই। বড় সাহেবেরা দরকার বুঝে টাই ছেড়েছেন কিন্তু ছোট বাবু ছাড়তে রাজী নন।

যে ভারতবর্ষের জেলে জাল বুনবার সুতো পায় না, লক্ষ লক্ষ শিশু এক ফোঁটা গো-দুগ্ধ পায় না, লক্ষ লক্ষ কারিগর তার মাল-মস্‌লা পায় না—সেদেশের চাহিদা ইণ্ডাষ্ট্রিওয়ালারা কতখানি উপলব্ধি করেছেন, তার প্রমাণ এই সংবাদ: "নিউইয়র্ক, ২০শে সেপ্টেম্বর, ভারতবর্ষ ব্রহ্ম ও সিংহলে ষ্টুডিবেকার মোটরগাড়ী নির্মাণ ও বণ্টনের জন্য ষ্টুডিবেকার্স লিমিটেড বিড়লা ব্রাদার্সের হিন্দুস্থান মোটরস্‌ লিমিটেডের সহিত এক চুক্তি করিয়াছেন—এ. পি. এ.।"—বসুমতী, ৭ই আশ্বিন, ১৩৫২।

ইংলণ্ডের বারলো স্কট এবং উটওয়াট কমিটির মতামত এবং টাউন এণ্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং বিভাগের সুপারিশগুলির মধ্যে মেশিনকে ও বিজ্ঞানকে কোথাও নিন্দা করা হয়নি। তাঁরা স্পষ্ট করে বলেছেন—প্ল্যানিংয়ের সব চেয়ে বড় বিষয় হলো মানুষ। ("planning exists fort he planned, and not for the planner"—Uthwatt Committee) মানুষের সংসারে সুখ ও কল্যাণকর অর্ঘ্য নিয়ে মেশিন ও বিজ্ঞান থাকবে। মানুষ ও মাটীকে নিয়ে লোফালুফি করে সার্কাস দেখাবার জন্য মেশিন নয়। মানুষের সংসারের ভিত্তি মাটীর ওপর। সুতরাং মেশিন ও বিজ্ঞান মাটীর রূপ সম্পদ্‌ শক্তি ও ঐশ্বর্যকে সেবা করার জন্যই নিযুক্ত থাকবে। অর্থাৎ মেশিনকে ও বিজ্ঞানকে মানুষের সেবায় ঠিক উপযুক্ত স্থানে বসিয়ে দেবার জন্যই এই প্ল্যানিং। মেশিন যেন মানুষের ঘাড়ে চেপে না বসে। সহর ও কারখানাকে যথেচ্ছা স্থান দিতে গিয়ে বাতাস কালো হয়ে গিয়েছিল, মাটীর তৃণ আবর্জনায় চাপা পড়েছিল। এই ভুলের ভিড় ভেঙে দিয়ে, মানুষের বসতিগৃহ, পথ, ক্ষেত, মাঠ, বন, বাগান, যন্ত্র ও কারখানাকে ঢেলে সাজাবার নতুন আয়োজন। প্রকৃতির সঙ্গে রূপ রস বর্ণ গন্ধের ছন্দ রেখে, মিলে মিশে চলবার একটা চেষ্টা।

গান্ধীজী-কথিত ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও গ্রাম-উন্নয়নের মূল সূত্র

হলো—(ক) বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralisation)। তিনি রাষ্ট্রিক গঠনে, গ্রাম-সংগঠনে, কুটীর-শিল্পে, শিক্ষা-ব্যবস্থায়, সহরের চেহারায়—সর্বক্ষেত্রে এই বিকেন্দ্রীকরণ নীতির পক্ষপাতী। তাঁর মতে বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থাই একমাত্র সমাজ-সঙ্গত ও ইতিহাস-সঙ্গত এবং স্বভাবসিদ্ধ। (খ) সবার ওপর গান্ধীজী মাটী-প্রেমিক। (গ) শারীরিক শ্রমকে তিনি বুদ্ধির শ্রমের চেয়ে বড় মনে করেন। (ঘ) প্রকৃতিকেই তিনি একমাত্র আর্ট মনে করেন। পৃথিবীর জনসাধারণের তিনিই একমাত্র প্রতিনিধি, যিনি দাবী করেছেন যে (ঙ) মেসিন মানুষের ঘরোয়া সম্পদ হোক্, ঘরের প্রয়োজনে মেশিন আসুক, মেশিনের প্রয়োজনে যেন ঘর না ভাঙে। (চ) প্রতি মানুষকে তিনি শিল্পী ও শ্রমিকরূপে দেখতে চান। (ছ) ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের কুটীর পথ ঘাট কূপ তড়াগ ও উদ্যানকে তিনি সংস্কার করে—প্রকৃতির পটে আঁকা এক একটি ছবির মত ফুটিয়ে তুলতে চান। (জ) ভারতবর্ষের গোজাতি বর্তমান দশায় বাৎসরিক তিন শত কোটি টাকার সম্পদ্ দিয়ে থাকে। গোজাতির যত্ন করলে বাৎসরিক দেড় হাজার কোটি টাকা আয় হতে পারে। এই গরু গান্ধীজীর কাছে তাই নিছক পশু নয়, গরু হলো—Poem of Pity; গান্ধীর কাব্যে তাই অর্থনীতি, তাঁর অর্থনীতিতে তাই কাব্য।

এই ভারতের কবিও মাটী-প্রেমিক। ফিরে চল মাটীর টানে—কবির বাণী অহরহ আমাদের ভুলের স্খলন থেকে টেনে এনে সোজা পথে দাঁড় করিয়ে দিতে চাইছে। নিতান্ত সহজ সরল ইতিহাসের কথা। যে অর্থ-নৈতিক দাবী জাতির চেতনায় কাজ করে চলেছে, কবির কথায় তারই সুরময় প্রতিধ্বনি।

এই মাটীর দাবীর মধ্যে মস্ত বড় অর্থনৈতিক সঙ্গতি রয়েছে, কিন্তু সেই জন্যেই এই দাবী আত্মিকতাহীন নয়। শুধু মাটীর অর্থনৈতিকতাটুকু নয়, মাটীর ফিলসফিও আমরা আজ নতুন করে বুঝতে পেরেছি। গান্ধীজী ও

রবীন্দ্রনাথের চিন্তার মধ্যে এই মাটীর দর্শন উপলব্ধিগত সত্যের মত প্রতিফলিত হয়েছে। ফিরে চল মাটীর টানে—এই মতবাদ তাই আমাদের কাছে শুধু আর্থিক আয়োজন নয়। এর মধ্যে আমরা এক সাংস্কৃতিক সত্যের আস্বাদ পাই। কাব্যে অর্থনীতিতে শিল্পে দর্শনে ও বিজ্ঞানে মাটীর গুণ যাচাই করে একটি অখণ্ড তাৎপর্য ধরতে পারা যায়। একথা সত্য যে, ইংলণ্ডের আধুনিকতম পরিকল্পনায় যে নতুন সুর দেখা দিয়েছে, তার মধ্যে ভারতীয় চিন্তার মত সমগ্রধর্মী শুদ্ধতা নেই। তাঁরা যেন সত্যের আভাসটুকু পেয়েছেন। অবশ্য কোন কোন য়ুরোপীয় মনস্বী ও বৈজ্ঞানিকের মনে যে এই তত্ত্ব ধরা পড়েনি তা নয়।

ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চভূতের মধ্যে একমাত্র ক্ষিতিই হলো জীবধাত্রী। জীবলীলার রঙ্গমঞ্চ এই মাটী। জীব ও উদ্ভিদ—প্রাণৈশ্বর্য-পরায়ণ এই দুই বস্তু মাটীর আশ্রয়েই উদ্ভূত। মাটী জীবনকে খাদ্য যোগায়। জীবকে পালন করার দায়িত্ব মাটীর। মাটি—উদ্ভিদ্—জীব, এই তিনের মধ্যে পরস্পর লালন ও পালন প্রক্রিয়ার একটা স্বাভাবিক ছন্দোবদ্ধতা আছে।

মাটীর সঙ্গে সম্পর্কের পরিণামের ভেতর দিয়েই মানুষের সভ্যতার আবির্ভাব। এই সম্পর্কের নাম কৃষি। ভারতবর্ষের মন মাটীর এই গৌরব ভুলতে পারেনি। তাই ভারতবাসীর মনস্তত্ত্বে অম্বুবাচীর মত কৃষি উৎসবের পরিকল্পনার সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতের সাংস্কৃতিক হৃদয়ের সম আবেগ দিয়ে তৈরী এই উৎসবের রূপ। কৃষির আবিষ্কার—সৃষ্টির বিরাট বিচিত্র আয়োজনের সঙ্গে মানুষ প্রথম তার ধ্যান ও কর্মের সহজ উদ্যমকে আবিষ্কার করলো। সেই দিনটি তার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রথম পুণ্যাহ। মানুষের সত্তার অন্নময় কোষ এই পৃথিবীর রেণুর মধ্যেই পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। প্রসূতি ও ধাত্রীর শক্তি পৃথিবীর মাটীতেই আধারভূতা হয়ে

আছে। এই ভূমি স্বয়ং জড় পরমাণুর সমষ্টি, কিন্তু কী প্রচুর প্রাণের সম্ভার এই জড়ের জঠর থেকে নিয়ত উৎসারিত হয়ে চলেছে! অম্বুবাচী ব্রতের মধ্যে হয়তো আমরা সেই আদিম অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহদের প্রিয় উর্বরতা-পূজার রেশটুকু বজায় রেখেছি। মাটীর উর্বরতা—মানুষের জ্ঞানের প্রথম বিস্ময়। কৃষির মধ্যেই মনুষ্যত্বের প্রথম কীর্তি ও শক্তির সফলতা। মাটীর প্রসাদেই মানুষ পেয়েছে তার প্রথম গান। তাই বুঝি এই সরিম্বরা পৃথিবী মানুষের কাছে মহামানবীর মহিমা লাভ করেছে।—মৃগশিরা নক্ষত্রের নিবৃত্তির পর আর্দ্রার প্রথম পাদে পৃথিবী রজস্বলা হন। বারিবর্ষণে রসযুক্তা পৃথিবী বীজাদি ধারণের উপযোগী হন। এই সময় হলকর্ষণ বর্জনীয়। স্নেহ সৌজন্য ও শ্রদ্ধা দিয়ে মাটীর মহত্ত্বকে নিরাপদ করে রাখতে হবে। মাটীতে আঁচড় দিও না, পৃথিবী ব্যথিতা হবেন।

মাটীর অনুগ্রহেই প্রথম বিজ্ঞান ও প্রথম কবিত্বকে পেয়েছিল মানুষ। প্রথম ফিলসফিও এই মাটীর শিক্ষার ফল। মানুষ প্রথম লাভ করলো তার মমতার ধর্ম—জীব ও উদ্ভিদের পরিধি পার হয়ে এই মানুষী মমতা জড় মাটীকেও অন্তরের বস্তু বলে স্বীকার করেছিল। সৃষ্টির এই অখণ্ডতা ও ঐক্যের উপলব্ধিই কি উপনিষদের প্রথম অধ্যায়টি রচনা করেনি?

বর্তমানে যে ব্যাপার বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতি নামে পরিচিত, তার মধ্যে এই ফিলসফি অস্বীকৃত। সেই কারণে এই পদ্ধতি সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক হতে পারেনি। বলতে পারা যায়—মুনাফাবাদী ব্যবসায়িক পদ্ধতি। অর্থাৎ কোন্ কৌশলে মাটী থেকে স্বল্প সময়ের মধ্যে সব চেয়ে বেশী শস্য আদায় করা যায়, তার ফলে মাটীর কি রইল কি গেল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। কলকাতার গয়লা যেমন ফুকাপ্রথায় গো-দহন করে বেশী দুধ আদায় করে, ট্র্যাক্টর ও কেমিক্যাল সারের দস্যুতাও মাটী থেকে সেইভাবে ফসল আদায় করে।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্যটি কি ?

"Health is whole. There is no separate human health, no separate vegetable, no separate soil health, and the way in which this whole can be got and maintained is that every living thing in it after its death should not be treated as waste but be returned to the soil. All dead animal and vegetable matter must be returned to the soil, so as to live again, if the whole of life is to be preserved. This is the first rule of life that gives to it wholeness, holiness and health."—Sir Bernard Greenwell.

স্যর বার্ণার্ড গ্রীনওয়েল উপনিষদ পড়েননি, তিনি একজন কৃষি-বৈজ্ঞানিক। প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি আছে বলেই তিনি হয়তো মাটীর ফিলসফির তাৎপর্যটুকু ধরতে পেরেছেন।

জীব ও উদ্ভিদ্ মাটী থেকে উদ্ভূত। সবই মাটীর প্রাপ্য। নইলে মাটীকে বঞ্চিত করা হয়। মাটীর ছন্দ ব্যাহত হয়। মাটীর প্রকৃতি বিপর্যস্ত হয়। মাটীর প্রসূতি ও ধাত্রীর ধর্ম ক্ষুণ্ণ হয়।

'Artificial manures tend inevitably to artificial nutrition, artificial food, artificial animals and finally to artificial men and women.

"All the phases of life cycle are closely connected, all are integral to Nature's activity ; we have therefore to study soil fertility in relation to natural working system and to adopt methods of investigation in strict relation to the subject"—Sir A. Howard, Imperial Chemist to Govt. of India.

কবি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের কল্পনা অনুভূতি ও গবেষণা একই সত্যের দিকে ইঙ্গিত করছে। মাটীর মর্যাদা ও ধর্মকে স্বীকার করেই মানুষের সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল, আবার মাটীর অমর্যাদা এবং মাটীর ধর্মকে বিস্মৃত হওয়ার পাপেই সহস্র মানুষ বিড়ম্বনায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলছে।

মাটী (অথবা প্রকৃতি) এবং মানুষের দুটি হাত (manual labour) —এই দুয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক থেকেই সভ্যতার এবং জ্ঞানের সূত্রপাত। মাটী বা প্রকৃতির সঙ্গে দেনা-পাওনার কারবার করে সহযোগিতা ও সৌহার্দ্যের প্রসাদেই মানুষ তার সংসারে এত নতুন রূপ ও শ্রী সৃষ্টি করতে পেরেছে। কিন্তু এত দূর এগিয়ে আসার পর মানুষ তার প্রথম রথের দুটি চাকার মূল্য ভুলে যেতে বসেছে—সেই মাটী ও কায়িক শ্রম। সভ্যতার ভ্রান্তি এইখানে চরম হয়ে উঠেছে। এরই ফলে অবসরবাদ (Leisure Theory) এবং নিষ্কর্মা অভিজাতশ্রেণীর জন্ম সম্ভব হয়েছে।

প্রকৃতিকে 'জয়' করেই নাকি মানুষ বড় হয়ে উঠেছে—এই দস্যুতার মনস্তত্ত্ব আধুনিক ইণ্ডাষ্ট্রীওয়ালা মানুষকে গ্রাস করে আছে। কিন্তু,

"In no case do we dominate Nature as the conqueror dominates an alien people, as though we are something standing outside Nature, but that on the contrary, since we with our flesh, blood and brain belong to Nature and are within Nature, we can only dominate it in so far as we, unlike other beings, are able to discover and correctly apply her laws."—Engels (Dialectic of Nature).

প্রকৃতিকে জয় করা যায় না। মাটীর মানুষকে প্রাণধারণের জন্য মাটীর কাছেই হাত পাততে হবে। মাটী—উদ্ভিদ্—পশু—মানুষ, এই

চতুঃসত্তার সমাবেশ নিয়েই জীবলীলার সংসার। এরা প্রকৃতির সৃষ্টি। মাটীর টানে ফিরে যাওয়ার অর্থ প্রকৃতিকে ফিরে পাওয়া।

মাটীই তো ইতিহাস, পৃথিবীর সব সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না মাটীর রেণুজালে বাঁধা আছে, মাটীর কাছে কিছুই লুকিয়ে রাখবার সাধ্য নেই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চাঁদসদাগরের পসরা মাটীর ভাণ্ডার থেকেই পাওয়া। জীবনের যাকিছু যেখানেই শূন্য করে দাও, মাটীর কাছেই ফিরে যাবে। বুদ্ধের অস্থি বা সীজারের মুকুট, সবই মাটীর পাওনা। মাটীই একমাত্র মহাজন। মাটী সব দেখছে। শত পাগলিনী প্রেমিকার গোপন অভিসার অন্ধকারের ধাঁধাঁয় কেউ না দেখুক, মাটী তার প্রতি পদধ্বনি গুণে রাখছে। গুপ্তঘাতক তার রক্তমাখা ছুরিকা মাটীতে মুছে সরে পড়ে! কেউ না জানুক, মাটী সব জানে। কিন্তু কত বিশ্বাসে ধীরা ও ধ্রুবা হয়ে আছেন এই ধরিত্রী, কাউকে ধরা পড়িয়ে দেন না। সহস্র প্রেম প্রণয় বিরহ, ত্যাগ শৌর্য বীর্য, শঠতা ও নিষ্ঠুরতার সাক্ষী এই পৃথিবী। কত তপস্বী বলাসুরের মেদ মজ্জা ও অস্থি আকাশ থেকে মাটীতে খসে পড়েছে, মাটীর গুণে রত্ন হয়ে গেছে—হীরা নীলা মরকত পদ্মরাগ। এই পৃথিবীর প্রতি পঞ্জরের আড়ালে লক্ষ বছরের [illegible] প্রতিটি চিহ্ন আঁকা আছে—ধাতু শিলা জল আগুন। কত মার্কো পোলো মেগাস্থিনিস আর [illegible] পথ চলার ইতিহাস মরু অরণ্যে এখন ধারণ করে রেখেছে এই মাটী। কত মন্দিরের চূড়া, কত বিগ্রহ, কত তুতেনখামেন, কত শিব! কত কিশ উর বাবিলন মহেঞ্জোদাড়ো। কত অরণ্যের সমাধি, কত ম্যামথের ফসিল। কত আকাশভ্রষ্ট উল্কার দগ্ধ হৃদ্‌পিণ্ড। মাটীর কাছে কিছুই অজানিত অবজ্ঞাত ও বিস্মৃত হয় না। চির জনমের ভিটাতে কেন প্রবাসীর বেশে ঘুরে বেড়াবে মানুষ? মাটিতে ফিরে যাওয়া মানুষের ইতিহাসকে ফিরে পাওয়া। জীবনের অখণ্ড রূপটিকে চিনতে পারা,

প্রকৃতির সঙ্গে সহজ ঐক্যটিকে উপলব্ধি করা, ধন জন সুখ সম্পদের আশ্রয়টিকে ফিরে পাওয়া।

মাটীতে পা পড়ে না, ইণ্ডাস্ট্রির প্রসাদে এমন কোন অহংকার যদি আমাদের হয়ে থাকে, তবে সেই সঙ্গে এইটুকু বুঝে নিতে হবে—সেই অহংকারের পতন হবে। এবং সব চেয়ে মজার ব্যাপার—এই পতনটা মাটীর ওপরেই হবে! রবীন্দ্রনাথের কবিতার অভিমানী কুম্‌ড়োটির পতন এইভাবেই হয়েছিল।

শিল্পের সামাজিক বনিয়াদ

জাতির শিল্পগত অভিরুচির মধ্যেই জাতির চারিত্রিক স্বরূপ খুঁজে পাওয়া যায়, একথা আমরা বহু মনীষীর মুখে শুনেছি। কোন জাতির উত্থান পতনের পেছনে যে বহু ও বিবিধ কারণ-পরম্পরার ক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়, ঐতিহাসিকেরা তার ভেতর থেকেও এই সিদ্ধান্তের সূত্র খুঁজে পেয়েছেন যে—শিল্প মরে তো জাতি মরে এবং শিল্প বাঁচে তো জাতি বাঁচে।

সুতরাং আমরা কি সঙ্গে সঙ্গে এই সিদ্ধান্তও করতে পারি না যে, শিল্পের অভ্যুত্থান যদি সম্ভব করা যায় তবে জাতির অভ্যুত্থানও অবধার্য ? এইরকম সিদ্ধান্ত করতে কোন বাধা থাকে না যদি শিল্পের সামাজিক বনিয়াদটুকু আমরা বুঝতে পারি।

শিল্প কি ? শিল্পের সামাজিক বনিয়াদ কোথায় ? সন্ধানী মনের কাছেও এই দুই প্রশ্নের উত্তর খুব সহজলভ্য ব্যাপার নয়। এক একটি প্রশ্নের সঙ্গে বহু আনুষঙ্গিক প্রশ্নের ভীড় এসে কোন সরল মীমাংসাকে আচ্ছন্ন করে তোলে। তবুও আধুনিক কালে সভ্যতার সঙ্কটে বিষণ্ণ মানুষের মনের কাছে এই বিষয়ে যেসব প্রশ্ন ও তথ্যের চাপ তার আত্মজিজ্ঞাসাকে ব্যাকুল করে তুলেছে, তারই অতি সাধারণ কতগুলি নিয়ম ও নীতি লক্ষ্য করা যাক্।

ভক্তিমতী সাধিকা মীরাবাঈ গান গাইতে গাইতে হাতের তারযন্ত্রটীর দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন : আরে মোর সারেঙ্গিয়া, মোর দিল্ বিচ সব সুর বাজে। হে আমার বীণ আমার অন্তরের মধ্যেই যে সব সুর বেজে চলেছে ! সুরসাধিকা অজ্ঞাতসারেই আর্টের ফিলসফি সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ তত্ত্বের কথাটাই ধ্বনিত করেছেন। শিল্পের বনিয়াদ তার উপকরণের মধ্যে আশ্রিত নয়। শিল্পের ঐশ্বর্য বাহ্যিক আস্পদের মধ্যে নিহিত নয়। শিল্পের বনিয়াদ

মানুষের মনের মধ্যেই। রিক্ত ও নিঃস্ব মনের শত কৌশলে ও ব্যায়ামেও আর্টের সৃষ্টি সম্ভব নয়। আর একটী ঐতিহাসিক উদাহরণ বিচার করা যাক্।

সমৃদ্ধ রোম নিশ্চয় উত্তুরে বর্বরদের চেয়ে শিল্পগুণে নিকৃষ্ট ছিল না। তবুও বর্বরদের আঘাতে রোমের জাতীয় শক্তি চূর্ণ হয়ে গেল কেন? শিল্পোন্নত রোমের এই দুর্বলতার রহস্য কি? রোমের বিরাট নাগরিক স্থাপত্য, এত নৃত্য সঙ্গীত কাব্য ও রত্নাভরণের জৌলুসের মধ্যে তা'হলে কি শুধু সামগ্রীটুকুই বড় জিনিস ছিল, তার মধ্যে শিল্প ছিল না?

এখানে প্রশ্নের সোজা উত্তর দেওয়া যায়—না ছিল না। রোমক সভ্যতা উচ্ছন্নে যাবার পূর্ব অধ্যায়ে নিশ্চয় কলালক্ষ্মী বিদায় নিয়েছিলেন। সিন্ধু-সভ্যতায় মহেঞ্জোদাড়োর বেদনাক্রান্ত অস্তিমে বোধ হয় এই ধরণেরই ভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল। এবং রীতিমত সংশয়ের সঙ্গে আমরা বর্তমান আমেরিকার মতিগতি ও রুচির দিকে তাকিয়ে দেখছি। সেখানে স্কাই স্ক্র্যাপারের অভ্রচুম্বী ঔদ্ধত্য নিছক ঔদ্ধত্য মাত্র। শিল্প সেখানে নিতান্ত বাহুল্যের ভারে আবর্জনা প্রায়। অজস্র সম্ভারে ইয়াঙ্কির সংসার পরিপূর্ণ কিন্তু সেখানে কলরডো ও নায়েগ্রার ভাষা নূতন সুরে ও গুঞ্জরণে রূপ গ্রহণ করতে পারেনি। আর্টের ক্ষেত্রে মার্কিনী মন কোন ঐশ্বর্য সৃষ্টি করতে পারেনি।

সুতরাং প্রশ্ন ওঠে, শিল্পের অধিষ্ঠান কোথায়? সরকারী গ্যালারীর স্তরে স্তবকে বা মঞ্চের মধ্যে নয়, বড়লোকের বৈঠকখানায় রঙীন আড়ম্বরের মধ্যে নয়, কোন আনুষ্ঠানিক ষোড়শোপচারের মধ্যে নয়। শিল্পের আশ্রয় জাতির মনস্তত্ত্বের মধ্যে। শুধু শিল্পসামগ্রী বা আর্টের বহিরঙ্গটুকু জাতিকে বড় করে তুলতে পারে না। শিল্পীর মনটীই জাতীয় সম্পদ। জাতির অন্তর্লোকে, প্রত্যেক মানুষের মনে শিল্পীর সত্তাটি প্রচ্ছন্ন বা প্রত্যক্ষ হয়ে

আছে, যার ফলে সৃষ্টি করার প্রেরণা সহজ আবেগের মত প্রত্যেক মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। একমাত্র তাই জাতীয় সংস্কৃতির মূল ভূমিকা। জাতির মনস্তাত্ত্বিক গঠনের মধ্যেই আমরা শিল্পের একটি সামাজিক বনিয়াদ খুঁজে পাই। এর পর আমরা সহজেই সেই রহস্যটুকু বুঝে ফেলতে পারি, কেন এত প্রাচুর্যে ও ঐশ্বর্যে ভরা সুখী ও বিলাসী রোম বর্বরতার কাছে পরাভব মানতে বাধ্য হয়েছিল। কেন মহেঞ্জোদাড়োর রত্নমালা সেই সভ্য জাতির অস্তিত্বকে শক্ত করে ধরে রাখতে পারেনি।

শিল্পের সামগ্রীগত মূল্যকে কেউ বড় করে দেখে না। শিল্পের মূল্য নির্ণয়ে মণদর বলে কোন পরিমাপের মান নেই। কোন বস্তুর শিল্পগত মূল্য তার ওজনের তারতম্যে হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। বফত্ হানা (বাতাসের বিনুনী) নামে যে অত্যাশ্চর্য মসলিনকে শিল্পী সৃষ্টি করেছেন, তার এক গাঁইটের ও একটী টুক্‌রোর শিল্পগত মূল্য একই।

নন্দলাল বাবুর আঁকা মূল ছবি 'শিবের বিষপানে'র মূল্য এবং ঐ ছবিরই মুদ্রিত কপির মূল্য রসিক মনের কাছে কখনই এক হতে পারে না। কেন? মূল ছবিটীর মধ্যে এমন কোন্ বৈভব আছে যা অ্যালবাম-নিবদ্ধ মুদ্রিত কপির মধ্যে নেই?

এটা কি আশ্চর্য হবার কথা নয় যে য়ুরোপ ও আমেরিকার মত উন্নত মেশিনের দেশের মানুষেরাও যখন সখের জিনিস কেনেন তখন মানুষের হাতে গড়া জিনিসটীর জন্য দু'পয়সা বেশী দাম দিয়ে থাকেন। মেশিনের তৈরী অলংকারে পশ্চিমের ললনাদেরও রুচি তৃপ্ত হয় না। শিল্পীর নিজের হাতের গড়া জিনিসটীর জন্যই তাঁদের স্বাভাবিক আগ্রহ দেখা যায়।

হাতে-গড়া শিল্পের মধ্যে কোন্ বিচিত্র সত্তার একটা সজীব স্পর্শ লুকিয়ে রয়েছে, যা মেশিনের নিখুঁত সৃষ্টির মধ্যেও নেই? প্রশ্ন আরও জটিল হয়ে পড়ে, যদি বলা যায় যে ঐ মেশিনও তো মানুষের

হাতেই চলছে। তবে মেশিনগড়া জিনিসকে হাত-গড়া জিনিস বলতে বাধা কি?

উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে শিল্পের আর একটী সামাজিক বনিয়াদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। শিল্পের মানবিকতা। সর্বক্ষেত্রে, সকল চিন্তা ও কর্মের মধ্যে, সৃষ্টি ও অনুশীলনের প্রয়াসের মধ্যে ব্যক্তি-মানুষের মন বৃহত্তর মানবিক আত্মীয়তার স্পর্শটুকু পাওয়ার জন্য কাঙাল হয়ে রয়েছে। মানুষ তাই নিছক জড় লীলার অগ্নি বায়ু সূর্য ও পবন পর্জন্যকে মানুষের রূপে কল্পনা করেছে। গরু ঘোড়ার মত পশু তাই মানুষের কাছে নিছক পশু নয়। তারা সুশীলা কপিলা ও চৈতক। মানুষের মতই এক একটী সমাদরের নামে তারা মানুষের পারিবারিক অন্তরের সঙ্গী হয়েছে। মানুষ তার বাড়ীর নাম দেয়, গাড়ীর নাম দেয়। বসন্ত রায়ের তরবারিটীর নামও 'গঙ্গাজল'। জড় বা জীব, এমন কি কঠোর বুদ্ধিজ চিন্তার দেহহীন নির্ব্যক্তিক (abstract) সত্তাকেও রূপের ও রসের অনুলেপনে মানুষ তার ওপর কায়া ও প্রাণের আরোপ করে। এই কায়া মানুষেরই কায়ার মত এবং সহস্র কাব্যে তারই মানবিক রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। দার্শনিকের কাছে যে-বিষয় শুধু একটা বাৎসল্যের ব্যাখ্যা মাত্র, শিল্পী মানুষের কাছে তাই যশোদা-কৃষ্ণ। তাত্ত্বিকের কাছে যে-বিষয় দুর্জয় নশ্বরতা ও মৃত্যু-লোকের অজ্ঞেয় রহস্য, শিল্পী মানুষের কাছে তাই সাবিত্রী-সত্যবান ও বেহুলা-লখিন্দরের মূর্তি। ছোট ছেলে প্রবৃত্তির বশে যেমন সব জিনিসকে মুখের কাছে টেনে এনে আস্বাদ নিতে চায়, শিল্পী মানুষের প্রবৃত্তির ভঙ্গীও কতকটা তাই। জড় জীব বা নির্বিকল্প চিন্তা—সব কিছুকেই মানুষের রূপে তৈরী করে নিয়ে, তবেই সে আত্মিকতার আস্বাদ গ্রহণ করতে পারে। শিল্পীর হাতে গড়া জিনিসের মধ্যে, তার ব্যক্তিগত মনের মাধুরী যেন মিশে রয়েছে। ক্রেতা অবশ্যই পয়সা দিয়ে এই শিল্প কিনে থাকেন,

কিন্তু তবু এই শিল্পকে হাতে-তুলে-দেওয়া উপহারের মত প্রীতিময় মনে হয়। মেশিনের তৈরী শিল্পকে ক্রেতা এতটা রসোপেত বস্তু মনে করে না। শিল্পের একটা সামাজিক বনিয়াদ—মানবিকতা বা হিউম্যানিজম্।

এইবার আর একটী প্রশ্ন তোলা যাক্। আজকের দিনে আমাদের কাছে অশোক স্তম্ভের মূল্য কি শুধু তার লৌহময় ওজনটুকুর সমান? প্রিয়-জনের দেওয়া একটি দু'পয়সা দামের উপহার যাবজ্জীবন যত্ন করে রাখার অভিলাষ কোথা থেকে আসে? ভারতবর্ষের কোহিনুরের দাম কি শুধু বাজারের হীরের দরে যাচাই করা যায়? আজকের বুদ্ধাস্থি কি শুধু অস্থি মাত্র? মাইকেল মধুসূদনের সমাধিক্ষেত্রের একটি গোলাপ ফুলের চেয়ে মার্কেটের একটি দামাস্কা গোলাপের তোড়া, মূল্যগুণে বেশী কি কম? ঠিক এই প্রশ্নের সূত্রেই আমরা আরও বহু জিজ্ঞাসার জের টানতে পারি। একটি সারনাথের পুতুল, একটি জগন্নাথের পটের ছবি, একটি বিবেকানন্দের বাস্ট্, এরা কি শিল্প মাত্র না সামগ্রী মাত্র? এর মূল্যনির্ণয়ের কোন মান আছে কি?

এরাও শিল্প নিশ্চয়, কিন্তু এর আর্ট লৌকিক মূল্যে নির্ণীত হবার নয়। কারণ এর মধ্যে বিগত ইতিহাসের এক ভাবময় সত্তার স্পর্শ রয়েছে। বহু শতাব্দীর বহু মানুষের অনুভব দিয়ে গড়া এইসব শিল্পগত নিদর্শন জাতির মনের বিশেষ একটা শূন্যতাকে পরিপূর্ণ করে রয়েছে। ইতিহাস, ঐতিহ্য, ঘটনা প্রভৃতির আনুষঙ্গিক সেন্টিমেন্টের সঙ্গে এই সব শিল্পকীর্তি একাত্ম হয়ে আছে, এটাই তার যথার্থ মূল্য। এখানে এসে আমরা শিল্পের আর একটি সামাজিক বনিয়াদ পেলাম। সেণ্টিমেণ্ট বা অনুভবগত বনিয়াদ।

এর পর একবার কল্পনা করা যাক্, স্পেনীয় দস্যুবণিক সাবেক্ আমেরিকার অ্যাজটেক্ বা মায়া কারিগরের বুকে বেয়নেট চেপে সোণার মূর্তি তৈরী করিয়ে নিচ্ছে। লক্ষ লক্ষ বন্দী দাস ও শ্রমিক প্রাণপাত করে

মিশরের পিরামিড গড়ে তুলছে; এক হাতে দাদনের কব্‌লা ও আর এক হাতে বন্দুক নিয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পেয়াদা বাঙালী তাঁতীর উঠোনে দাঁড়িয়ে মস্‌লিন তৈরী করাচ্ছে। কিম্বা, আধুনিক ভারতীয় পুঁজিপতির কারখানায় মজুরীভোগী শিল্পী ও কারিগরের দল দাসত্বের অঙ্কুশে তাড়িত হয়ে দিনের পর দিন বহু বিচিত্র দারুময় ও ধাতুময় উপকরণ তৈরী করে চলেছে। এই শিল্পকে আমরা কি সত্যিই 'শিল্প' আখ্যা দিতে পারি? কোন পুঁজিপতি যদি এইভাবে তাঁর পটারি কারখানায় শ্রমিকের শ্রমকে অশ্রদ্ধ বঞ্চনার কৌশলে আয়ত্ত করে, দৈনিক একলক্ষ ধ্যানী শিবের মূর্তি তৈরী করে দু'পয়সা দামে বিক্রী করেন, তবুও কি সমাজতত্ত্বের বিচারে তা সমর্থনীয় হতে পারে? কখনই না। শিল্পের সাধনার পদ্ধতি কখনই এতটা নীতিহীন হতে পারে না। ঐ ধরণের শিল্পরীতি জাতিকে সমৃদ্ধ করা দূরে থাক্‌, বরং জাতিকে নিঃস্ব করবেই।

সুতরাং নৈতিক ভিত্তি নামে শিল্পের আর একটী সামাজিক বনিয়াদ আছে, একথা যেন আমরা ভুলে না যাই। ক্লিওপেট্রাকে হত্যা করে তাঁর কবরীনিবদ্ধ স্বর্ণপুষ্পটী যাকেই উপহার দেওয়া যাক্‌, তার মধ্যে প্রীতির মহিমা কখনো থাকতে পারে না। গ্রহীতার মন এ উপহার হাত পেতে নিতে শিউরে উঠবে, কারণ তার সঙ্গে এক নীতিহীন নিষ্ঠুরতার অদৃশ্য রক্তবিন্দু মিশে আছে।

আর্টের নীতিগত ভিত্তি সভ্য মানুষ কখনো পরিহার করতে পারে না। মালা আর তরবারির পার্থক্যকে ঘুচিয়ে দেওয়া শিল্পের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তবে, নীতিগত ভিত্তিটা কি?

উপমার সাহায্যে একটা উত্তর দিতে পারা যায়। এই উপমা গান্ধীজীর লজিক থেকে ধার করা। মৌমাছি নামে একটী শিল্পী-পতঙ্গের কাজের প্রণালী সবাই লক্ষ্য করেছেন। মৌমাছি শুধু শিল্পী নয়; কেমিস্টও।

প্রত্যুষের আলোকের সাড়া জাগবার মুহূর্ত থেকে আরম্ভ করে দিন সমাপনের আবছা আঁধারের প্রথম মুহূর্ত পর্যন্ত এই শিল্পী পতঙ্গ ফুলের মধু আহরণ করে বেড়ায়। কিন্তু ফুলের জীবন বিপন্ন হয় না অথবা ফুলের বর্ণ ও সৌরভের কিছুমাত্র হানি হয় না। শিল্পসৃষ্টির নৈতিক বনিয়াদ এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রয়েছে। কিন্তু আধুনিক পুঁজিবাদের নিয়মে শ্রমিকের জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেই শিল্প সৃষ্টি হয়ে থাকে। সোস্যালিস্ট বিচারেই বলুন বা সরল মানবতাধর্মী বিচারেই বলুন, শিল্পের এই নৈতিক ভিত্তিকে অটুট রাখাই সভ্যতার মর্যাদা।

এইবার আর একটা দৃষ্টান্ত সম্মুখে রেখে শিল্পের সামাজিক বনিয়াদের আর এক দফা সূত্র আবিষ্কার করা যাক্। শিল্প বা আর্টের ক্ষেত্রে বর্তমানে দুটো ক্ষতিকর প্রথা প্রবল হয়ে উঠেছে। এ দুটোর মধ্যেই সামাজিক বনিয়াদ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। প্রথম, ছকবাঁধা (standardised) রীতি। দ্বিতীয়, ওস্তাদী (specialised) রীতি। যে দিন থেকে ক্ষমতাবান সম্প্রদায় সভ্যতাকে মার্কেটের ছাঁচে গড়ে তোলবার জন্য তৈরী হয়েছেন, সেদিন থেকেই এই দুটী মানবতা-বিরোধী রীতি শিল্পের সামাজিক ধর্মকে চাপা দিতে আরম্ভ করেছে। বর্তমানে আমরা দেখতে পাই, শিল্পসৃষ্টির ব্যাপারে ব্যক্তিগত অধিকারের নিয়ম। একজন নৃত্যপরা পাভলোভা বা ইসাডোরা ডান্‌কানের কীর্তি এক লক্ষ নৃত্যকুশলতাহীন মানুষ হাঁ করে তাকিয়ে দেখে। একজন সুকণ্ঠ ওস্তাদের সঙ্গীত এক হাজার শ্রোতা বোবার মত তাকিয়ে শোনে। মানুষের প্রথম সামাজিক অভ্যুদয়ের মূলে এধরণের ব্যাপার সম্ভব হয়নি। শিল্পের ক্ষেত্রে সেদিন এককতার স্থান প্রধান হয়ে ওঠেনি। সমষ্টিগত উদ্যোগে সৃষ্টি ও চর্চার নিয়মই স্বাভাবিক ছিল। বর্তমানে 'খেলা' (sport) নামে আর একটী সাংস্কৃতিক অনুশীলনের মধ্যে এই ওস্তাদী-রীতিকে বড় করে মেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু শিল্প নিতান্তই

লোকগত বিষয়। নিজে সৃষ্টিকুশলতাহীন ও নিষ্কর্মা থেকে অপরের শিল্পসৃষ্টিকে উপভোগ করাই সভ্যতাসঙ্গত পন্থা নয়। এবং ছক-বাঁধা মাপে শিল্পসৃষ্টি করলেও সেটা শিল্প হয় না। যেহেতু বৈচিত্র্য সমাজের একটী রূপ ও অঙ্গ, সেহেতু শিল্পের রূপের বৈচিত্র্যও স্বাভাবিক। শিল্পসৃষ্টির শক্তিতে দীনতা দেখা দিলেই ধরাবাঁধা 'প্যাটার্নে'র আধিপত্য প্রবল হয়ে ওঠে। শিল্পে 'ডিজাইন' ও 'ফর্ম' কাম্য বিষয়, কিন্তু তথাকথিত প্যাটার্ন বা ষ্ট্যাণ্ডার্ড কদাপি নয়। বর্তমানে দেখতে পাই, শিল্পের ক্ষেত্রে ঘোড়ার আগে গাড়ী লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারিগরেরা এক ছাঁচে এক লক্ষ পরিচ্ছদ তৈরী করেন, মানুষ কষ্টে-সৃষ্টে তার মধ্যে হাত-পা-মাথা গলিয়ে নিজেকে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করে। মানুষের দাবীতে শিল্পসৃষ্টি না হয়ে শিল্পের দাবীতে মানুষকে গড়বার চেষ্টা—এই জটিলতার ফলে শুধু লাভ হয়েছে শিল্পের অপভ্রংশ।

একমাত্র সামাজিক জীব মানুষই শিল্প সৃষ্টি করে। বাবুই পাখী যে বিচিত্র নীড় রচনার কৃতিত্ব দেখায়, সেটা তার শিল্পীমনের কাজ নয়, নেহাৎই জৈবিক প্রবৃত্তিজাত আচরণ। একটুখানি রঙ মাখিয়ে দিলে বাবুই পাখীর বাসা আরও সুন্দর হতে পারে, কিন্তু আমরা জানি এতখানি বিচারবান কোন বাবুই পাখী নেই। সামাজিকতার গুণেই মানুষ শিল্পী হতে পেরেছে, এটা ঐতিহাসিক সত্য। সেই কারণে, শিল্পও নিতান্ত সামাজিকতার ব্যাপার। অর্থাৎ, অপরকে নিবেদন করার জন্য এর সৃষ্টি, নিতান্ত আত্মোপভোগের জন্য নয়। সেক্সপীয়ার আমাদেরই জন্য কাব্য সৃষ্টি করেছেন, তানসেন আমাদেরই জন্য গাইতেন, রবিবর্মা আমাদেরই জন্য ছবি এঁকেছেন। শিল্প নিভৃত তপস্যার মত ব্যাপার নয়। আদান-প্রদানের নিয়মে, প্রচারের ধর্মে ও অপরের অনুভবের সঙ্গে নিজস্ব উপলব্ধির সাযুজ্য ও বিনিময়েই শিল্প সার্থক হয়ে থাকে। যে শিল্পীর দৃষ্টি সামাজিক

মনে সাড়া তুলতে পারে না, তাকে ব্যর্থ শিল্প বলেই ধরে নিতে হবে। অপরে বুঝতে পারে, এইটুকু প্রসাদগুণ না থাকলে শিল্প আবর্জনামাত্র হয়ে দাঁড়ায়। সবাকার স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধার ওপরেই শিল্পের সামাজিক বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত।

তারপর, শিল্প মানুষের জীবনে আচরণের রূপে প্রকাশ লাভ করে। কিন্তু এই আচরণও সামাজিক বনিয়াদের সঙ্গে একটা বৈজ্ঞানিক নিয়মে সংযুক্ত। শিল্প ও জীবন—এ দুটী বিচ্ছিন্ন দুটী বিষয় নয়। শিল্প জীবনকে মণ্ডিত অভিভূত বা আচ্ছন্ন করে আছে। জীবন নামে ভিন্ন একটা জৈবিক আচরণ এবং মাঝে মাঝে শিল্প নামে একটা সামাজিক আচরণ, মানুষ এভাবে নিজের সত্তাকে খণ্ড খণ্ড ভাবে সার্থক করতে পারে না। তবুও আমরা দেখতে পাই, আজকের দিনের নানা ভ্রান্তি ও জটিলতার মধ্যে মানুষ এই একটী সামাজিক বনিয়াদ হারিয়ে ফেলতে চলেছে। 'কাজ' নামে আচরণকে আমরা নিছক জীবিকা অর্জনের একটা শ্রমপূর্ণ ভিন্ন অধ্যায় বলে স্বীকার করে নিয়েছি। এই 'কাজ' সারা হবার পর নাকি মানুষ শিল্প সৃষ্টি বা উপভোগ করে থাকে। এই ভুলের বশেই 'অবসর' নামে একটা অদ্ভুত (Leisure theory) ব্যাপার দেখা দিয়েছে। এই অবসর বিনোদনের জন্যেই নাকি নাচ গান হাসিতামাসা ও শিল্পকলার প্রয়োজন।

এইখানে জিজ্ঞাস্য, কাজের মধ্যেই হাসি গান বর্ণ ছন্দ সৌরভ মিশিয়ে থাকলে দোষ কি? মানুষের সমাজে শিল্পের আবির্ভাব এইভাবেই তো হয়েছিল। প্রথম মানুষ যিনি প্রথম মাটীর বুকে ফসল ফলাবার স্বপ্ন নিয়ে ধানের বীজ বপন করেছিলেন, তিনি সেদিন কাজের প্রেরণাকেই সুন্দর করার জন্য গান গেয়েছিলেন। 'কাজ' নামে আচরণটাই বর্তমানে একটা লক্ষ্মীছাড়া ব্যাপার। ক্লান্তি ও অবসাদই এর একমাত্র উপহার। বাণিজ্য-

গত সভ্যতার প্রকোপে এই ভুল আরও তীব্র হয়ে উঠেছে, যদিও মানুষ মর্মে মর্মে জানে যে, রূপরসহীন কাজের মধ্যে তার মন ও শরীর কোনটাই তৃপ্ত হয় না। যেহেতু মানুষ শুধু দেহ দিয়েই কাজ করে না, মন দিয়েও কাজ করে, সেই হেতু কাজের মধ্যে আর্টের সমারোহ থাকা চাই। এটা শিল্পের সামাজিক বনিয়াদ।

শিল্পের সামাজিক বনিয়াদ যেমন আছে, তেমনি সমাজের প্রাকৃতিক বনিয়াদ আছে। কিন্তু এই সহজ সত্যটী আমরা ক্ষণে ক্ষণে বিস্মৃত হই। সেই জন্যই এমন কথা পণ্ডিতদের মুখে শোনা যায় যে—প্রকৃতিকে পরাভব করে মানুষ এগিয়ে চলেছে। প্রকৃতি সম্বন্ধে এই অপ্রাকৃতিক ধারণা মানুষের শিল্পকে কিছু কিছু বিভ্রান্ত করেছে। আর্ট শুধু জাতীয় ব্যাপার নয়, মোটামুটি আন্তর্জাতিকও নয়, ধর্মতঃ জাগতিক ব্যাপার। মানুষ নিজেই প্রকৃতির অংশ, সুতরাং প্রকৃতিকে জয় করার প্রশ্নই আসে না। এবং মানুষের সৃষ্টি প্রত্যেক শিল্পে এই প্রকৃতির আবেদনটুকু বাদ পড়লে, সেটাও অসামাজিক হয়ে পড়ে। শিল্পী মানুষের কল্পনার মধ্যেও প্রকৃতির পরমাণু সমাবিষ্ট হয়ে আছে। এমন কোন বর্ণ গন্ধ ছন্দ সুর ও সৌরভ মানুষ কল্পনা করতে পারে না, প্রকৃতির মধ্যে যার নজীর নেই। প্রকৃতির মধ্যে যা আছে, তাকে আরো বেশী করে পাওয়াই শিল্পের লক্ষ্য। এমন কোন কবিতা যদি আমরা পড়ি, যা পড়ে হাসি আসে না, কল্পনাও পায় না, রাগও হয় না, ভাবও হয় না—পার্থিব কোন রূপ রস অনুভবের সাড়া জাগে না—সেখানে বুঝতে হবে যে সেটা কবিতাই নয়। কারণ সেটা প্রকৃতিহীন। সেটা অক্ষরের আবর্জনা মাত্র। সেই জন্যেই যদি কোন চিত্রকর জ্যামিতিক উপপাদ্যের মূর্তির মত একটা কিছু এঁকে আমাদের কাছে এসে দাবী করেন যে তিনি 'ছবি' এঁকেছেন, আমরা স্বাভাবিক সংশয়ে চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হই। সেই জন্যই কতকগুলি চটুল শব্দ সাজিয়ে একটা কিছু রচনা

করে যখন কোন কবি এসে বলেন, এটা কবিতা লিখেছি, তখনই আমাদের মন বিরূপ হয়ে ওঠে। পনর হাজার বছর আগেকার চর্যার গান ও ছড়া আজও আমরা অনুভব দিয়ে উপভোগ করি, সেটা আজও সাহিত্য হয়ে হাজারো উপকথায় ও রূপকথায় আমাদের সঙ্গে বেঁচে রয়েছে। কিন্তু ডাকিনীর তুক্ তাক্ ঝাড়ফুঁকের ভয়াবহ শব্দটংকারকে আজও আমরা সাহিত্য বলে স্বীকার করিনি এবং সেটা ব্যর্থ হয়ে গেছে। এর একমাত্র কারণ, প্রাকৃতিকতার অভাব। প্রকৃতির সঙ্গে এসব সৃষ্টির যোগ ছিল না। চিন্তা ও বিকারের মধ্যে যে প্রাকৃতিকতার পার্থক্য, রূপকথা ও ডাকিনীর মন্ত্রে সেই পার্থক্য। শিল্পের সামাজিক বনিয়াদের আর একটা বিষয় হলো শিল্পের প্রাকৃতিকতা।

ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে—শিল্পের উদ্দেশ্য হলো লোকরঞ্জন। সভ্যতার ক্ষেত্রে শিল্পের সার্থকতা সম্বন্ধে এর চেয়ে বড় সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। শিল্পের আভিজাত্য বা কৌলীন্যের মধ্যেই শিল্পের মৃত্যুর বীজ নিহিত থাকে। 'বহুজনসুখায়' এবং 'বহুজনহিতায়' শিল্পের সাধনা। লোকময়তার মধ্যেই এর আয়ু। শিল্প যদি অল্প কয়েকজন ভাগ্যবানের অনুগ্রহ ও চর্চার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে, তবে সেই শিল্প মন্দস্রোত নদীর মত নিজের আলস্যেই দূষিত ও পঙ্কিল হয়ে উঠবে। পৃথিবীর ইতিহাসে এই শিক্ষাই বার বার মানুষকে সাবধান করে দিয়েছে যে, রাজার অনুগ্রহ বা কোন বৃত্তিপুষ্ট ঘরানার চেষ্টার জোরে শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। সবসাধারণের আচরণ রুচি ও কুশলতার মধ্যেই শিল্পের প্রাণপীঠ স্থাপিত। লোকে শিল্পকে সৃষ্টি করলে, তবেই শিল্প লোকোত্তর হবার শক্তি লাভ করে। অজন্তা ঘরানার চিত্রাঙ্কনপদ্ধতি আজ আর বেঁচে নেই, সেই রীতির ঐতিহ্য কোন শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিভার মধ্যে ধারাবাহিক ভঙ্গীতে এগিয়ে আসতে পারেনি। কারণ, সন্দেহ হয়, অজন্তা-পদ্ধতি হয়তো এক কুলীন শিল্পী

সম্প্রদায়ের মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ ছিল। অন্যদিকে দেখতে পাই, আল্‌পনা-রীতি আজও বিনা রাজানুগ্রহ ও কোন প্রচণ্ড শিল্পাচার্যের অনুশাসন ব্যতিরেকে জনসমাজে সজীব হয়ে রয়েছে। শিল্পের এই স্বচলতার বনিয়াদ হলো লোকসাধারণের প্রতিভা। গোষ্ঠী বিশেষে শিল্প যদি কেন্দ্রিকতা (Centralisation) লাভ করে, তা'হলে সেই শিল্প সামাজিক বনিয়াদ থেকে বিচ্যুত হবে এবং সে-শিল্প অকাল মৌশুমী বাতাসের মত একটা রসিক আবহাওয়া সৃষ্টি করলেও, চিরকালের পরিণামের মধ্যে তার কোন দান থাকবে না।

শিল্পের সৃষ্টির ক্ষেত্রে আর একটা বনিয়াদের সন্ধান পাই এর সহজ-স্ফূর্তির মধ্যে। শিল্প বিধিবদ্ধতাকে (Codification) সহ্য করতে পারে না। টেক্‌নিকের জ্ঞান এখানে ভূমিকার মত উপচার মাত্র, কিন্তু টেক্‌নিক শিল্পের পরিণাম নয় এবং প্রেরণাও নয়। ভাস্কর যদি শুধু প্রতিমালক্ষণের সূত্রগুলি পড়ে, হুবহু মিলিয়ে মিলিয়ে মূর্তি নির্মাণ করেন তবে সেটা নির্জীব শিল্প মাত্র হবে। শিল্পীর জগৎ মাত্রা দিয়ে বাঁধা নয়, কিন্তু সমাজবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কাজেই শিল্পে বিধিবদ্ধতা যেমন দূষণীয়, তেমনি খেয়ালী অনাচারও অপরাধ। নিছক কাল্পনিকতার মধ্যে শিল্পের কোন বনিয়াদ নেই, নিছক বাস্তবিকতার মধ্যেও নেই। জাগতিক জীবনের প্রতিটী প্রত্যক্ষ বাস্তবের সঙ্গে, সকল মনের মাধুরী মিশিয়ে রচিত নতুন এক রসলোক এই শিল্প। শিল্পীর জগৎ বায়রণের স্বপ্নের মত: A dream which is not all a dream.

"নয়ী তালিমী"

স্থান ওয়ার্ধা সেবাগ্রাম, তারিখ ১১ই জানুয়ারী ১৯৪৫, সময় সকাল আটটা।

ওয়ার্ধার সকাল আটটার অর্থ মাত্র প্রত্যূষ। সূর্যোদয়ের আভাসের চেয়ে চন্দ্রাস্তের সৌন্দর্যেই পূর্ব আকাশের পট তখন আভাময় হয়ে আছে। স্পষ্ট বোঝা যায় না, এই আলোক জেগে উঠছে অথবা ঘুমিয়ে পড়ছে। শুধু ছিন্ন কুয়াশার আড়ালে নূপুরনিক্কণের মত ছোট ছোট পাখীর ডাকে বাতাসের সুপ্তি ভাঙে। সত্যিই বোঝা যায় যে ভোর হয়েছে।

আজ আবার আধঘণ্টা পরেই রাষ্ট্রীয় শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হবে। প্রতিনিধিদের ক্যাম্প ছেড়ে আমরা বাইরের পথে এসে দাঁড়ালাম। চারদিকের দৃশ্যটা এইবার আরও স্পষ্ট হয়ে নজরে আসে। মধ্যপ্রদেশের এক নিরস্তপাদপ প্রান্তর, বিরাট এক খোলা হাওয়ার হৃদয় যেন শৈলবলয়ে ঘেরা হয়ে পড়ে আছে। নিকটেই গ্রামসেবা শিবিরের ওপর সুউচ্চ জাতীয় পতাকার গায়ে জোর বাতাসের সাড়া লেগেছে। খাদি বিদ্যালয়ের দিকে আমরা এগিয়ে গেলাম। সেইখানে অধিবেশনের আয়োজন হয়েছে। ভারতবর্ষের সকল প্রান্ত থেকে শিক্ষোৎসাহী প্রতিনিধিরা এসেছেন।

দিনটা মেঘলা, বাতাস বেশ ঠাণ্ডা। অল্পক্ষণের মধ্যেই সাদা চাদরে মাথা-মুড়ি-দেওয়া এক বৃদ্ধের মূর্তি ধীরে ধীরে সভাগৃহে প্রবেশ করলেন। জনতার কলরব সেই মুহূর্তে শান্ত হয়ে গেল।

আমরা সবাই তাকিয়েছিলাম তাঁরই দিকে। আমাদের সেই ক্ষণিক অনুভবের আবেশকে শুধু একটা কথায় ব্যক্ত করা যায়। আমাদের মনে মনে শুধু এই একটা কথা ধ্বনিত হচ্ছিল—তিনি আবার দেখা দিয়েছেন, আবার দেখা দিয়েছেন।

আমাদের জাতির জীবনের ইতিহাসের দূত মহাত্মা গান্ধী আবার দেখা দিয়েছেন। তিনি সঙ্কটে আছেন, সংগ্রামে আছেন, অভ্যুত্থানে আছেন। আজ আবার দেখা দিয়েছেন সংগঠনে। মাঝে মাঝে ঘটনার এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে বিস্ময় মানতে হয়। সারা জাতির যে আগ্রহ ও বেদনা নিঃশব্দ হয়ে বাতাসে ছড়িয়ে আছে, শ্বেতশঙ্খের মত তিনি নিজের মধ্যে সেই বাতাস আহরণ করেন। পরমুহূর্তে তাঁর বাণীতে প্রতিধ্বনিত হয় নতুন মুক্তির মন্ত্র, নবজীবনের পদ্ধতি, নতুন পথ-চলার কৌশল। ঠিক এই মুহূর্তে সমগ্র জাতির চিত্ত অজ্ঞাতসারে যে অচেনা সত্যকে খুঁজছে, তিনি সেই সত্যকে জ্ঞাত করেন।

রাষ্ট্রীয় শিক্ষা সম্মেলনের উদ্বোধনে সভাগৃহের জনতা গান্ধীজীর নতুন বাণী শুনতে পেল 'আমরা এইবার উপসাগর ছেড়ে মহাসাগরে পাড়ি দিতে চললাম।'

মহাসাগরে পাড়ি দিতে চললাম। এই বাণীর তাৎপর্য বুঝতে একটু দেরী হলো আমাদের, কারণ গান্ধীজীর মুখে এই উদাত্ত নির্ঘোষ শুনবার জন্যে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। জাতির জীবন-তরী মহাসাগরে পাড়ি দিতে চলেছে কিন্তু তার বৈঠাটা কি?

জাতির শিক্ষা এই বৈঠা। এই বৈঠাই গান্ধীজী-প্রবর্তিত বনিয়াদী তালিমী (Basic Education)। বনিয়াদী তালিমীকে একটা পূর্ণতর তাৎপর্যে উন্নীত করে গান্ধীজী এর একটা সামাজিক ও দার্শনিক আদর্শ স্থাপিত করেছেন, যাকে তিনি নাম দিয়েছেন নয়ী তালিমী বা নূতন শিক্ষা।

বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা মোটামুটিভাবে গান্ধীজীর পরিকল্পিত এই বনিয়াদী তালিমীর পদ্ধতি ও তাৎপর্য এবং নয়ী তালিমীর আদর্শগত তত্ত্ব বুঝবার চেষ্টা করবো।

গান্ধীজীর প্রথম কথা হলো: আমাদের দেশের বর্তমান ইংরাজী শিক্ষা-পদ্ধতি জাতির জীবনে কল্যাণসৃষ্টির চেয়ে হানি সৃষ্টি করছে বেশী। অর্থাৎ ইংরাজী শিক্ষা-পদ্ধতি আমাদের মধ্যে ব্যর্থ হয়নি, বরং সফল হয়েছে। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে, ইংরাজী শিক্ষাপদ্ধতির যা উদ্দেশ্য ছিল, তা বাস্তবে কার্যকরী হয়েছে। জনসাধারণের মনুষ্যত্বকে খর্ব করার কাজ সফল হয়েছে।

গান্ধীজীর এই অভিমত সমর্থন করার আগে একটু বিশ্লেষণ এবং গান্ধীজীর যুক্তিগুলি ভাল করে বিচার করা দরকার।

শিক্ষার অর্থ কি? গান্ধীজীর মতে, দুইটী অধ্যায়ে সামাজিক মানুষের মনুষ্যত্ব গঠিত—(১) জীবনের অধ্যায় এবং (২) জীবিকার অধ্যায়।

বায়োলজির গোড়ার সত্যে পৌঁছে আমরা গান্ধীজীর এই অভিমত সমর্থন করতে পারি। জীবনের দাবী এবং জীবিকার দাবীতে যদি মিল থাকে, এই দুই অঙ্গাঙ্গী হয় তবেই পূর্ণত্ব আসে, তবেই জীবনের ছন্দ অটুট থাকে।

নিতান্ত বস্তুগত অর্থেও বলা যায় যে, জীবনের যা ধারক ও বাহক তারই নাম জীবিকা। জীবিকার অক্ষমতা জীবনের অক্ষমতা।

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে এবং প্রথম উদ্দেশ্য হবে এই জীবিকা নামক মানুষের সামাজিক (অথবা বায়োলজিকাল) আচরণকে সুস্থ সক্ষম ও স্বচ্ছন্দে প্রতিষ্ঠিত করা।

পশু পাখী ঠিক মানুষের মত সামাজিক জীব নয়। তবুও দেখা যা যে জীবিকা সম্বন্ধে তাদের কোন ব্যর্থতা নেই। প্রকৃতিগত শক্তিে (instinctive) তারা জীবিকা অটুট রাখে অর্থাৎ জীবনধারণের উপযোগ অথবা আত্মরক্ষার উপযোগী সকল কর্তব্যকেই পূর্ণ করার শবি

তারা রাখে। খাদ্য এবং ভোজ্য সংগ্রহের কৌশলে ও সামর্থ্যে তারা দীন নয়।

যেহেতু মানুষ উন্নত-সামাজিক জীব সেহেতু মানুষের উচিত ছিল যে, সে আত্মরক্ষায় ও জীবনধারণে আরও সুস্থ ও শক্তিশালী হবে। অর্থাৎ নিজকে শিক্ষিত করার (জ্ঞান আহরণ করার) যে সামাজিক গুণ ও কৌশল মানুষ আয়ত্ত করেছে তার ফলে সে তার জীবিকাকে উন্নত এবং সুন্দর এবং আরও সফল করবে।

মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে এই তত্ত্ব একদিন সত্য ছিল। সভ্যতার সূচনা এইভাবেই হয়েছিল। মানুষ 'শিক্ষিত' হয়েছিল নিজের ব্যক্তিত্ব ও সামাজিকতাকে উন্নত করার জন্যই। শিক্ষা ছিল তার জীবিকার সহায়ক। যে যত জীবিকায় সক্ষম, সে-ই তত শিক্ষিত, এটাই সমাজ-বিজ্ঞানের নিয়ম।

এখন একেবারে আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষার যুগে চলে আসা যাক্। এইখানে এসে আমরা দেখতে পাই শিক্ষার চরম ব্যর্থতা। যে যত ইংরাজী পদ্ধতিতে শিক্ষিত, সে তত জীবিকা অর্জনে অক্ষম। শিক্ষার সংজ্ঞা সম্বন্ধে গান্ধীজী যে মাপকাঠি তৈরী করেছেন, তাই দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, বর্তমান যুগে অন্যান্য যে কোন দেশের চেয়ে এবং ভারতের যে কোন বিগত যুগের চেয়ে আমাদের দেশের বর্তমান 'শিক্ষিতেরা' জীবিকা অর্জনে সর্বাধিক অক্ষম। এইখানে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে।

তাই বনিয়াদী শিক্ষার প্রথম কথা হলো, মানুষকে তার জীবিকায় সুপ্রতিষ্ঠ করা অর্থাৎ তার জীবনধারণের যোগ্যতাকে উন্নত করা। যে-শিক্ষা মানুষকে জীবিকার সন্ধান দেয় না, সে-শিক্ষা শিক্ষাই নয়।

সুতরাং বনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির প্রথম বিষয় হলো—'ছাত্র শিল্পকার্যের

(craft) ভেতর দিয়ে জ্ঞানলাভ করবে।' এই শিল্পকার্যকেই ছাত্র তার ভবিষ্যৎ জীবনে জীবিকারূপে গ্রহণ করতে পারবে।

এখানে ক্রাফ্‌ট্‌ অর্থ নিছক শিল্পকার্য নয়। চরকা, তাঁত, বেতের কাজ, ছুতারের কাজ যেমন শিল্পকার্য, বনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতে কৃষি, গোপালন প্রভৃতিও তেমনি একটা ক্রাফ্‌ট্‌ বা শিল্পকার্য। গান্ধীজী ক্রাফ্‌ট্‌ সম্বন্ধে আরও উদার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সম্পদসৃষ্টিকর এমন অনেক কাজ আছে, ক্রাফ্‌টের পর্যায়ে তিনি ফেলেছেন—যথা, কূপ খনন করা, বাঁধ রচনা করা, গ্রামের রাস্তা তৈয়ারী ইত্যাদি।

ছাত্রের শিক্ষার আশ্রয় হলো এইসব ক্রাফ্‌ট্‌ বা শিল্পকার্য।

কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, এর মধ্যে নতুনত্ব কি আছে? বর্তমানে আমাদের দেশে অনেক শিল্প বিদ্যালয় আছে। (Industrial School), কিণ্ডারগার্টেন, মণ্টেসারি প্রভৃতি শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যেও খেলাধূলা, প্রাকৃতিক পরিবেশের ব্যবস্থা এবং শিল্পচর্চার ব্যবস্থা আছে। কবি রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপদ্ধতিতে অনেকখানি এই ধরণের নতুনত্ব এনেছিলেন। সুতরাং গান্ধীজী-পরিকল্পিত বনিয়াদী তালিমীর বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য কি?

উত্তর: আকাশ-পাতাল পার্থক্য। মণ্টেসারি ইত্যাদি যেসকল শিক্ষাপদ্ধতির নাম করা গেল, সেইসব পদ্ধতিকে বলা যায়—শিক্ষা এবং শিল্প (Education & Craft), শিক্ষা এবং প্রকৃতি (Education & Nature) ইত্যাদি। এর মধ্যে শিক্ষার জন্য একটা পৃথক্ পদ্ধতি আছে, তার পাশে রয়েছে শিল্পকার্য, খেলা, প্রকৃতি ইত্যাদি। ছাত্রেরা শিক্ষকের উপদেশ শুনে, এবং বই পড়েই জ্ঞান আহরণ করে এবং তারপরে খানিকটা অবসাদ স্খালনের জন্য শিল্প খেলা ইত্যাদি বিনোদনের (Recreative) কাজ করে। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল স্কুলগুলির পদ্ধতি তো

একেবারেই নির্মম। সেখানে বিনোদনের কোন বালাই নেই। শিল্প-শিক্ষার ব্যাপারটা সেখানে সম্পূর্ণভাবে খাটুনি (task) মাত্র।

বনিয়াদী পদ্ধতি এঁর বিপরীত। বনিয়াদী পদ্ধতি হলো—শিল্পের ভেতর দিয়ে শিক্ষা (Education through Craft)। এর মধ্যে শিল্পকাজ ও খেলার কোন ভেদাভেদ নেই। খেলাও একটা শিল্প এবং শিল্পও একটা খেলা। এর মধ্যে খাটুনি বা taskএর কোন রূঢ়তার প্রশ্ন আসে না। কারণ সমগ্র শিল্পকাজ একটা আনন্দকর সাধনা হিসাবে এর মধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। বনিয়াদী স্কুলের ছাত্রেরা আগে বই পড়ে, তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে নক্ষত্রের রূপ নির্ণয় করবে না। আগে আকাশের দিকে তাকিয়ে নক্ষত্র চিনবে, মনের মধ্যে পড়বে, তারপর বই থাক বা না থাক।

গান্ধীজী তাই এই পদ্ধতিকে বলেছেন—'জীবনের ভেতর দিয়ে জীবনের শিক্ষা' (Education of life through life)।

বনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বিবরণ এইবার জানা দরকার :

(১) সাত থেকে চৌদ্দ বছর বয়সকেই বনিয়াদী বয়স (Basic period) হিসাবে ধরা হয়েছে।

(২) এই সাত বছরে ছাত্র যে জ্ঞানলাভ করবে অর্থাৎ তাকে যেসব বিষয় শেখানো হবে তাকে খুব স্থূলভাবে তুলনা করে বলা যায়—বর্তমানের ম্যাট্রিকুলেশন (ইংরাজী ছাড়া)।

(৩) বনিয়াদী অধ্যায় ছাড়া আরও দুইটি অধ্যায়ের শিক্ষাপদ্ধতি ব্যবস্থিত করা হয়েছে—(১) প্রাক্ বনিয়াদী (Pre-Basic), ছাত্রের বয়স তিন থেকে সাত বছর এবং (২) উত্তর বনিয়াদী (Post-Basic), ছাত্রের বয়স চৌদ্দের উর্ধ্বে।

(৪) উক্ত তিনটি অধ্যায়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্যক্রম (Syllabus) এবং শিল্পকার্যের বিভিন্ন ক্রম নির্ধারিত হয়েছে।

(৫) প্রতি ত্রিশজন ছাত্রের জন্য একজন করে শিক্ষক নিযুক্ত থাকবেন।

(৬) একমাত্র মাতৃভাষা মারফৎ শিক্ষা দেওয়া হবে।

(৭) ছাত্রের কোন স্কুল ফী বা বেতন দিতে হবে না।

(৮) বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিল্পকার্যের মারফৎ যে পণ্য হবে, তারই লাভ থেকে শিক্ষকের বেতন নির্বাহ হবে।

(৯) ধর্মপ্রচারমূলক বা ধর্মতত্ত্ববিষয়ক কোন শিক্ষা দেওয়া হবে না।

বনিয়াদী পদ্ধতির একটা বড় কথা হলো, স্কুলটাও স্বাবলম্বী হবে। অর্থাৎ ছাত্রেরা যে শিল্পপণ্য সৃষ্টি করবে, তার বিক্রীর লাভ থেকে শিক্ষকের বেতন নির্বাহ করা হবে। শিক্ষকের বেতন মাসিক ২৫৲ টাকা ধার্য করা হয়েছে (যুদ্ধপূর্ব বাজার দর ও অবস্থার হিসাবে)।

বনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির যে পরিকল্পনা দেশবাসীর সম্মুখে রাখা হয়েছে, সেই উদ্যোগের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাক্।

হরিপুরা কংগ্রেসে এই মর্মে একটা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল : "ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যে শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহার ব্যর্থতা স্বীকৃত হইয়াছে।......এই শিক্ষা-পদ্ধতির লক্ষ্য পুরাতনধর্ম্মী এবং ইহা ক্ষুদ্রসংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ। সুতরাং শিক্ষা-পদ্ধতিকে একটা নূতন ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া জনসাধারণকে শিক্ষিত করিতে হইবে......এই উদ্দেশ্যে একটা নিখিল ভারত শিক্ষা বোর্ড গঠিত হউক্।"

হরিপুরা কংগ্রেসের নির্দেশ অনুযায়ী যে নিঃ ভাঃ শিক্ষা বোর্ড গঠিত হয়, তারই নাম হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘ। এই সঙ্ঘের উদ্যোগে ডাঃ জাকির হোসেনের নেতৃত্বে একটা কমিটী গঠন করা হয় এবং এই কমিটী বনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে একটা পরিকল্পনার রিপোর্ট ও পাঠ্যক্রম (Syllabus)

রচনা করেন। গান্ধীজী এই পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। জাকির হোসেন কমিটির প্রত্যেকটী প্রস্তাব গান্ধীজী স্বয়ং বিচার বিশ্লেষণ ও সংশোধন করেছেন এবং বাদানুবাদও হয়েছে। এর ফলে শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নতুন থীসিস তৈরী হয়েছে, যা শুধু ভারতবর্ষের বিশেষ একটা প্রয়োজনের দাবী মেটাবার জন্য নয়, পৃথিবীর শিক্ষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা নতুন বৈপ্লবিক পদ্ধতি উপস্থিত করেছে।

এই বনিয়াদী পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক রূপ ও বৈপ্লবিক তাৎপর্য একে একে বিচার করে দেখা যাক্। বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে না গিয়ে আমরা মাত্র এই পদ্ধতির মূল সূত্রগুলিকে একত্রে সাজিয়ে নিয়ে দেখবো। এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য ও সিদ্ধান্তগুলি সংক্ষেপে সাজালে এইরকম দাঁড়ায়:—

(১) খুব অল্প সময়ের মধ্যে সর্বসাধারণকে শিক্ষিত করা। (২) একমাত্র লিপি বা ছাপার অক্ষর পড়তে সক্ষম হওয়া অর্থ শিক্ষিত হওয়া নয়। (৩) বুদ্ধিশক্তিকে কাজে লাগাবার ক্ষমতাকেই 'শিক্ষা' বলে। (৪) শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষের অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠ ও সহজাত শক্তির বিকাশ। (৫) শিক্ষাপদ্ধতি এমন হওয়া চাই যা বিস্তর ব্যয়সাপেক্ষ নয়, ব্যয়ের বোঝা যত লঘু হয় (economy) ততই ভাল। (৬) দৈহিক পরিশ্রম ও মানসিক বা বৌদ্ধিক শ্রমের (Intellectual labour) কোন মর্যাদাগত তারতম্য নেই। (৭) দৈহিক শ্রমের (Manual labour) মারফৎ সকল মানসিক শিক্ষা লাভ করতে হবে। (৮) শিক্ষিত কারিগর (educated craftsman) তৈরী করা বনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়— শিল্পকার্যের ভেতর যে জ্ঞানশিক্ষার উপাদান রয়েছে, সেই সব উপাদান থেকে তাৎপর্য্য আহরণ করে জ্ঞান অর্জন করা (exploitation for educative purposes of the resources implicit in craft work)।

ছোট ছেলেদের দিয়ে যদি স্কুলে শিল্পকার্য করানো হয়, তবে সেটা

তাদের পক্ষে একটা কঠিন বোঝা হলো না কি? ছাত্রেরা কি মজুর হবে?

গান্ধীজী বলেন, শিল্পকার্য খেলার মত একটা আনন্দের জিনিষ। তক্‌লি এবং চরকা পুতুলজাতীয় জিনিষ মাত্র। শুধু এই ধরণের পুতুল (চরকা তক্‌লি) থেকে সম্পদ সৃষ্টি হয় বলেই এর পুতুলত্ব কমে যায় না।

যে ছোট ছেলে নিজের শ্রমের জোরে নিজের বিদ্যাশিক্ষার খরচ চালাবে, সেই ছোট ছেলে এতটা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হবে যে তাকে 'মজুর' বলবার কোন সাহস আপনার হবে না। পয়সার বদলে যে পরের কাজ করে তাকে 'মজুর' বলা হয়। বনিয়াদী স্কুলের ছেলে নিজের জন্য কাজ করবে।

বনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতিতে সত্যিই স্কুলগুলি স্বাবলম্বী হতে পারবে কি?

মহাত্মা গান্ধী তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, যেকোন ছোট ছেলে উপযুক্ত শিক্ষকের দ্বারা পরিচালিত হয়ে দক্ষতা অর্জন করার পর দৈনিক চার আনা (দৈনিক চার ঘণ্টা পরিশ্রম করে) আয় করতে পারে। সুতরাং স্কুলের খরচ সে নিজেই যোগাতে সক্ষম।

জাকির হোসেন কমিটীর কথা হলো: বনিয়াদী স্কুলগুলি একেবারে বর্ণে বর্ণে স্বাবলম্বী হবে এমন কোন কথা জোর করে বলা হচ্ছে না। স্বাবলম্বিতার কথা বাদ দিলেও বনিয়াদী পদ্ধতি অন্যান্য গুণের দাবীতেই সব চেয়ে ভাল পদ্ধতি। তা ছাড়া, এর মধ্যে অনেকখানি 'স্বাবলম্বিতা' সত্যিই রয়েছে। হিসাব করে দেখা গেছে, ৩০ জন ছাত্রে গঠিত একটী বনিয়াদী স্কুলের (যার শিল্পকার্য হলো চরকা ও তাঁত) সাত বছরের খরচ (অর্থাৎ শিক্ষকের বেতন) হয় ১২০০৲ টাকা, এবং সাত বছরের ছাত্রদের শ্রমার্জিত আয় হয় ১৮২৫৲ টাকা। দেখা যাচ্ছে যে স্কুলগুলি প্রায় স্বাবলম্বী হতে বারে।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, টাকার অভাবের জন্যই কি গান্ধীজী জাতির শিক্ষার জন্য এই বনিয়াদী পদ্ধতি রচনা করেছেন ?

উত্তর : না। জাতির দানে বা রাজস্বের অনুগ্রহে অনেক টাকার সঙ্গতি হলেও বনিয়াদী প্রথা উপেক্ষিত হবে না এবং হওয়া উচিত নয়। নিছক 'সস্তায়' শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে এই পদ্ধতি রচিত হয়নি। এটা একটা পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। ছাত্রকে জ্ঞানী করার সব চেয়ে বেশী সম্ভাব্যতা এই পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে। সামাজিক উৎসবের মত জাতির স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মধ্যে এই পদ্ধতি ওতপ্রোত হয়ে থাকবে। এক একটা বিরাট কৃত্রিম ডিপার্টমেণ্ট সৃষ্টি করে এই পদ্ধতিকে চালু রাখতে হবে না। জাতীয় আচার (National habit) এবং সামাজিক উৎসবের মত এই পদ্ধতি সহজ ও সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে থাকবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শিল্পকার্য শিক্ষা বনিয়াদী পদ্ধতির মূল কথা নয়। জ্ঞানের পাঠ দেওয়াই মূল উদ্দেশ্য, কিন্তু এই জ্ঞান শুধু টেক্সট্ বুকের মারফৎ শেখানো যায় না। যে-ছেলে ভবিষ্যৎ জীবনে ব্যাঙ্ক চালাবে তার পক্ষেও স্কুলে কোন শিল্পকার্যের (তাঁত ইত্যাদি) মারফৎ জ্ঞান ও শিক্ষালাভ করা উচিত—সেটাই সহজ স্বাভাবিক পদ্ধতি। সময়ও কম লাগে।

এর পর আসে বনিয়াদী স্কুলের শিক্ষকের কথা। বনিয়াদী পদ্ধতিতে শিক্ষকের ট্রেণিং একটি বড় বিষয়। শিক্ষকের প্রতিভা ও কৃতিত্বের ওপর এই পদ্ধতির সার্থকতা অনেকখানি নির্ভর করে।

যারা নিছক জীবিকা অর্জনের জন্য অর্থাৎ 'স্কুলমাষ্টারী' করার জন্য বনিয়াদী স্কুলের শিক্ষক হতে চাইবেন, তাঁদের ভুল হবে। তাঁরা নিজের এবং পরের ক্ষতি করবেন। বর্তমানে প্রয়োজন 'ব্রতী' মনোভাবের শিক্ষক অর্থাৎ মিশনারির উৎসাহ ও আদর্শবাদ যাঁদের আছে। 'শিক্ষা' সম্বন্ধে

এবং জীবন সম্বন্ধে তাঁদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গী থাকবে। বনিয়াদী স্কুলের শিক্ষকের সব চেয়ে বড় জ্ঞাতব্য ও কর্তব্য হলো—শিল্পকার্য ও পাঠ্য-বিষয়কে সমন্বিত করার (correlate) টেক্‌নিক আয়ত্ত করা। স্পিনিং বা সুতাকাটা (চরকা) যেখানে শিল্পকার্য, তার মধ্যে শিক্ষক অনায়াসে ইতিহাস ভূগোল ও গণিতের নানা তথ্য ও অধ্যায়ের পাঠ দিতে পারেন। তক্‌লি ও চরকার গঠনের প্রসঙ্গে জ্যামিতি অনায়াসে শেখানো যায়, তুলার প্রসঙ্গে মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাস, বাণিজ্যিক অর্থনীতি ও ভূগোল শেখানো যায়। কৃষির মারফৎ রসায়ন পদার্থ-বিদ্যা ও উদ্ভিদ্‌-বিদ্যার বিবিধ প্রসঙ্গ আনা যায়।

বনিয়াদী পদ্ধতির দিকে একবার লক্ষ্য করলেই, প্রথমে একটা খট্‌কা লাগে। মনে হয়, শুধু গ্রামের প্রয়োজন সম্মুখে রেখেই এই পদ্ধতি রচনা করা হয়েছে। সহরের এবং সহরে মানুষের প্রয়োজনের দিক এর মধ্যে বিবেচিত হয়নি।

এই অনুমান মোটামুটিভাবে সত্য। প্রধানতঃ গ্রামকে শিক্ষিত করার কাজ বনিয়াদী পদ্ধতির লক্ষ্য। সহর যদি ইচ্ছা করে এবং সদুদ্দেশ্য নিয়ে উৎসাহী হয়, তবে এই পদ্ধতিকে নিতে পারে। তবে সহর সম্বন্ধে গান্ধীজীর যা ধারণা, তার মধ্যে সহরবাসীর পক্ষে লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হবার কথা। গান্ধীজী বিশ্বাস করেন, ভারতের জাতি আজও সাত লাখ গ্রামের মধ্যেই রয়েছে। গ্রাম বাঁচলে জাতিও বাঁচবে। গ্রাম শিক্ষিত হলে জাতি শিক্ষিত হবে। (সহরের স্বরূপ গান্ধীজী বিশ্লেষণ করেছেন…'the city people have, perhaps unwittingly, joined in the British exploitation of the village'.)

কালেজী শিক্ষার ব্যাপার নিয়ে তাই গান্ধীজী বর্তমানে কোন

সংস্কারের প্রস্তাব বা কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। কারণ ওটা নিছক 'সহরে সমস্যা' (urban problem)। সরকারী প্রাইমারী শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মত সুস্পষ্ট—'সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও ক্ষতিকর শিক্ষা।'

কালেজী শিক্ষার মধ্যে গবেষণা (Research) ও বই পড়ার ব্যাপারটাই (Academic) বড়। সেদিক দিয়ে বিচার করলে এই সহুরে পদ্ধতি 'একেবারে ব্যর্থ' হয়নি, তবে এর প্রত্যক্ষ ফল নিশ্চয়ই নিরাশাজনক।

বনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতে জ্ঞানের পাঠ যে সব চেয়ে বড় লক্ষ্য তা স্পষ্ট বোঝা যায় এর পাঠ্যক্রমের দিকে তাকালে। উদাহরণ:—একটী বনিয়াদী (Basic) স্কুল—প্রথম অধ্যায় (Grade I)—ছাত্রের বয়স সাত বছর—বনিয়াদী শিল্পকার্য (Basic Craft) হলো বাগানের কাজ (Gardening)।

পাঠ্যক্রম: শরীর, পরিচ্ছদ, স্কুলগৃহ, প্রাকৃতিক বিষয়, দৈনন্দিন ঘটনা ইত্যাদির নাম ও পরিচয় জানা। রূপকথা, উপকথা, প্রকৃতি-কথা, জীবজন্তুর জীবন-কাহিনী, বিভিন্ন দেশের জীবজগতের কাহিনী, আদিম মানুষের কাহিনী এবং পারিবারিক কাহিনী গল্পের রূপে শোনা। ছোট ছোট কবিতার আবৃত্তি। ছোট ছোট নাটিকার অভিনয়। ছোট ছোট বাক্য শব্দ পাঠ করা।

এই অধ্যায় একমাত্র মৌখিক শিক্ষার অধ্যায়, লিপি বা লেখার কোন স্থান এর মধ্যে নেই। ভাষা—মাতৃভাষা।

এইবার বনিয়াদী পদ্ধতির যতটুকু প্রয়োগ হয়েছে, তার ফলাফল ও ইতিহাস যাচাই করা যাক্।

কংগ্রেস যখন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে তখন কয়েকটী প্রদেশে বনিয়াদী পদ্ধতি চালু করার আয়োজন হয় এবং স্কুল স্থাপিত হতে থাকে। কিন্তু দেড় বছর পরেই কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব বর্জন করে। প্রত্যেক প্রদেশে বনিয়াদী স্কুলগুলি

সরকারী আনুকূল্যের অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। একমাত্র বিহার প্রদেশে কতগুলি স্কুল সরকারী আনুকূল্যে চলতে থাকে। বর্তমানে বিহারে ২৭টী বনিয়াদী স্কুল আছে, এর জন্য বার্ষিক খরচ পড়ে ৬০ হাজার টাকা।

খরচের এই অঙ্কের পরিমাণ দেখে অনেকে আঁৎকে উঠবেন। কিন্তু একটী বিষয় স্মরণ রাখা উচিত, সরকারী সকল ব্যাপারেই কাজ অনুসারে পরিমিত ব্যয়ের নিষ্ঠা নেই। সরকারী বেড়ালের বিয়েতে লাখ টাকা খরচ হওয়াটাই নিয়ম, কারণ বিভাগীয় ব্যবস্থাটাই অনর্থক ব্যয়বাহুল্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তা না হয়ে যদি ঠিক যথাযথ বনিয়াদী পদ্ধতির নির্দেশ অনুসারে বৈজ্ঞানিকোচিত উপায়ে এই ২৭টী স্কুল চালিত হতো, তবে এতখানি খরচ হতো না। তা সত্ত্বেও ঐ স্কুলগুলির ছাত্রেরা বর্তমানে শিল্পকার্যের ভেতর যে পণ্য উৎপন্ন করে, তার দাম ধরলে খরচের শতকরা ১৫ ভাগ রিটার্ণ আসে এবং আর দু'এক বছরের মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ রিটার্ণ আসবে (সম্মেলনে বিহার প্রতিনিধির মন্তব্য)।

বিহারের বনিয়াদী স্কুলের ছাত্রেরা যে নিছক 'মজুর' ও ভোঁতাবুদ্ধি হয়ে যায়নি, বরং তার উল্টোটাই সত্য হয়েছে, তার প্রমাণ স্বরূপ পাটনার ট্রেণিং কলেজের অধ্যাপক চ্যাটার্জীর একটী মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা গেল। ছাত্রদের মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা করে তিনি বলেছেন: "পরীক্ষা করে আমি এইটুকু সত্য স্পষ্ট করে বুঝতে পারছি যে বনিয়াদী স্কুলে চার বছর শিক্ষালাভ করে ছাত্রেরা যতখানি জ্ঞানী ও গুণী হতে পেরেছে, সাধারণ প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রদের চেয়ে তা অনেকগুণে শ্রেয়।"

কিন্তু আবার একটা বেয়াড়া প্রশ্ন আসছে। ধরে নিলাম, বনিয়াদী পদ্ধতিতে শিক্ষিত হয়ে ছাত্র জ্ঞানী হলো, গুণী হলো, জীবিকা অর্জনে সক্ষম হলো। কিন্তু এর মধ্যেই সব কথা বলা হলো কি? এর পরেও প্রশ্ন আসতে

পারে, এর পরে কি আর কোন উদ্দেশ্য নেই ? এই 'শিক্ষিত' হওয়াই কি একমাত্র লাভ"?

জ্ঞানী হওয়া গুণী হওয়া—এগুলি এক একটা অস্পষ্ট কথা। জ্ঞান কাকে বলে, গুণ কাকে বলে, এই নিয়েই মতভেদ উঠবে।

এই সব বেয়াড়া প্রশ্নের উত্তর গান্ধীজী খুব ছোট একটা কথার মধ্যে সরল করে বলে দিয়েছেন। বনিয়াদী শিক্ষার সব চেয়ে বড় লাভ হলো,—"গ্রামের ছেলে বুঝতে পারবে যে সে শুধু বাপ-মায়ের ছেলে নয়, সে গ্রামের ছেলে।"

বনিয়াদী শিক্ষার মারফৎ গ্রামের ছেলে যে চরিত্র লাভ করবে, তা গান্ধীজীর এই সরল ব্যাখ্যার মধ্যে রয়েছে। ব্যক্তিবোধের চেয়ে সমাজ-বোধ বড় হয়ে উঠবে, মনুষ্যত্বের এই মহত্তম জাগৃতির বীজ রয়েছে বনিয়াদী পদ্ধতির মধ্যে। এই বনিয়াদী পদ্ধতির উদ্দেশ্য। সকল লক্ষ্য সাফল্য ও কৃতিত্বের তালিকার মধ্যে গান্ধীজী এই চরিত্র-সম্পদকেই বড় করে দেখেছেন। শিক্ষা-পদ্ধতির কাম্যই এই। যে মনের জোরে মানুষ ইতর জীবের পর্যায় থেকে এত বড় হয়ে উঠেছে সেই সমাজী মনোভাব সৃষ্টি করাই বনিয়াদী পদ্ধতির আসল কাজ। তারপর আসে গুণ ও জ্ঞানের কথা।

আমাদের সরকার বাহাদুরও একটা যুদ্ধোত্তর শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করেছেন। এই পরিকল্পনা সার্জেণ্ট পরিকল্পনা নামে পরিচিত। যুদ্ধ থেমে গেলে নাকি এই পরিকল্পনাকে ফলবতী করা হবে।

সাত লক্ষ দরিদ্র গ্রামের কোটী কোটী নরনারীর তরফে গান্ধীজী বলতে চান—'শিক্ষা' নামে যে একটী সাধনা আছে, তাকে কোন বিশেষ লগ্নের জন্য মুলতুবী রাখা যায় না। শিক্ষার প্রয়োজন যখন আছে, তা এই মুহূর্তেই আরম্ভ হবে।

সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় ৪০ বছরের মধ্যে ভারতবাসীকে শিক্ষিত করার

আশ্বাস দেওয়া হয়েছে এবং সেই ঢিমে তেতালা ব্যবস্থার জন্য খরচ হবে কোটী কোটী। অর্থাৎ সার্জেন্ট পরিকল্পনা যেদিন কাজে লাগানো হবে, সেদিন যে বেচারার জন্ম, চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছবার পর হয়তো তার স্কুলে যাবার ডাক আসবে। আজ যার বয়স চল্লিশ, সে বেচারা তো ততদিনে মরে ভূত হয়ে যাবে, তার জন্য কোন সমস্যা নেই।

সার্জেন্টি প্রথায় ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার একমাসের যা খরচ, সারা ভারতের এক বছরের বনিয়াদী শিক্ষার খরচের চেয়ে তা বেশী।

হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘ প্রৌঢ়শিক্ষার (Adult Education) ব্যবস্থাও করছেন। ভারতে ছোট ছেলেমেয়ের সংখ্যা সাড়ে তিন কোটী। শুধু এদের শিক্ষা-ব্যবস্থা হলেই জাতির শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। বাকী কোটী কোটী প্রাপ্তবয়স্ক গ্রামবাসীর শিক্ষা অবশ্যই চাই এবং এই মুহূর্তেই তার আরম্ভ চাই। প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষাও বনিয়াদী পদ্ধতিতে হবে বলেই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে—অর্থাৎ মাতৃভাষা এবং শিল্পকার্যের মারফৎ মৌখিকভাবে জ্ঞানের পাঠ। যদি কেউ নিজের ইচ্ছায় লেখা বা পড়া শিখতে (literacy) চায়, তবে তার বিশেষ ব্যবস্থা করা হবে।

এই বনিয়াদী তালিমীকে গান্ধীজী আদর্শবাদী সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বিচার করে আরও তাৎপর্যপূর্ণ এক সংজ্ঞা দিয়েছেন—নয়ী তালিমী বা নতুন শিক্ষা।

হাঁ, এই শিক্ষা সম্পূর্ণ নতুন শিক্ষা। নতুন সদ্ধর্মের (Values) ওপর এই শিক্ষার ভিত্তি। এই শিক্ষা সক্রিয় ও সৃষ্টিপ্রবণ (Dynamic)। সমগ্র জীবনের বহিরঙ্গ অন্তরঙ্গ গতি ও পরিণাম নিয়ে এই শিক্ষার ব্যাপ্তি। জীবনে শিক্ষায় কোন সীমাবাধা অধ্যায় নেই। "মাতৃজঠরে ভ্রূণরূপে আবির্ভাবের মুহূর্ত থেকে সমাধিক্ষেত্রে প্রাণের শেষ অভিযান পর্যন্ত মানুষের

শিক্ষা একটা অখণ্ড অধ্যায়।" গান্ধীজীর নিগূঢ় দার্শনিক তাৎপর্য একটু তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলেই নয়ী তালিমীর আদর্শ বোঝা যাবে।

জীবন হলো সংগ্রাম, ঠিক কথা, গান্ধীজীর মত সংগ্রামী কর্মী পুরুষ এই তত্ত্ব অস্বীকার করবেন না। নিরন্তর সংগ্রাম আমাদের জীবনে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু এ ছাড়া আর একটী তত্ত্ব আছে—নিরন্তর শিক্ষা। জীবন হলো নিরন্তর শিক্ষা। সেই সাধনাই হলো শিক্ষা, যা দিয়ে আমরা নিজেকে যোগ্য করে তুলি, শক্তি সঞ্চয় করি, নিজেকে সাজাই। সংগ্রাম বা কাজ হলো নিজেকে ব্যক্ত করার সাধনা, নিজেকে কীর্তিত করা। শিক্ষায় আমরা গ্রহীতা, সংগ্রামে আমরা দাতা। শিক্ষার ঘাটে তরী পূর্ণ করে তুলি, সংগ্রামে তাকে বিলিয়ে দিই। শিক্ষা ও সংগ্রাম—এই দুই খণ্ডে আমাদের জীবন অখণ্ড ও পূর্ণ। দুই অধ্যায় একই সঙ্গে চলে। এরা যুক্তবেণীর মত একই সঙ্গে গ্রথিত হয়ে আছে।

নয়ী তালিমীর দার্শনিক পৈঁঠা ছেড়ে অর্থনীতিক পৈঁঠায় এসে জিজ্ঞাসা করা যাক্, গান্ধীজী এক্ষেত্রেও কোন ব্যাখ্যা দিয়েছেন কি না?

এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েই প্রবন্ধের উপসংহার টানবো, এবং প্রবন্ধের আরম্ভে ১১ই জানুয়ারীর মেঘলা সকালে যে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা সম্মেলনের উদ্বোধনে আমরা মহাসাগর যাত্রার বাণী শুনেছিলাম, তারই শেষ প্রস্তাব এইখানে উদ্ধৃত করবো।

"এই সম্মেলনের অভিমত এই যে, শিক্ষা-ব্যবস্থা এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যে একজন সাধারণ ছাত্র তার শিক্ষালাভের সমস্ত খরচ যোগাবার মত অর্থ নিজের শ্রমের দ্বারাই উপার্জন করতে সক্ষম হবে। এই উদ্দেশ্য একমাত্র সম্ভব হতে পারে যদি গ্রামের বিদ্যালয়গুলি স্বয়ং প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনের আধার হতে পারে এবং যদি সেই সামগ্রীগুলির মধ্যে যথার্থ জ্ঞানের পাঠ নেবার মত বৈশিষ্ট্য ও গুণ থাকে। এই উদ্দেশ্য সফল করতে

হলে দেশের (গ্রামের) অর্থনীতিক ব্যবস্থার মধ্যেও সঙ্গে সঙ্গে বৈপ্লবিক রূপান্তর আনতে হবে। শিক্ষা-ব্যবস্থায় এবং অর্থনীতিক ব্যবস্থায় এই দুই দফা বিপ্লব অবশ্যই সাধারণ মজুর ও দক্ষ কারিগর উভয়েরই উপার্জন-ক্ষমতাকে সকল দিক দিয়ে বাড়িয়ে তুলবে। অন্ন বস্ত্র বাসগৃহ প্রভৃতি জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলির উৎপাদন বহুলভাবে বাড়িয়ে তুলতে হবে। 'নয়ী তালিমীর' গবেষণার বিষয় হবে, ছোট পরিমাপের উৎপাদন-ব্যবস্থা (small scale production) বিকেন্দ্রীকৃতভাবে (decentralised হয়ে অর্থাৎ আত্মনির্ভরভাবে বহুল সংখ্যায় চারিদিকে ছড়িয়ে থেকে) থেকে কিভাবে অর্থনীতির দিক দিয়ে সফল হতে পারে। নয়ী তালিমী গ্রামের অর্থ নৈতিক শক্তিকে উন্নত করবে, কিন্তু তার জন্য গ্রামের শ্রমশক্তির উপর বোঝা বাড়াবে না। উৎপাদনের প্রথম লক্ষ্য হবে জাতির আভ্যন্তরীণ স্বয়ং-সম্পূর্ণতা (internal self-sufficiency) এবং শেষ সাধ্যমত জাতির সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান। উৎপাদনের উদ্দেশ্য হবে বাণিজ্যের মারফৎ সুদ আর লাভ অর্জন করা নয়, তার পরিবর্তে জাতির স্বয়ং-সম্পূর্ণতা এবং স্বাচ্ছন্দ্যই হবে উদ্দেশ্য।"

নয়ী তালিমী এই বৃহতী আকাঙ্খার সঙ্কেত। নবজীবনের আস্বাদের আশায় তৃষ্ণার্ত জাতির এই কামনা রাষ্ট্রীয় শিক্ষা সম্মেলনের প্রস্তাবে ধ্বনিত হয়েছে। খুব বড় আকাঙ্খা সন্দেহ নেই।

কিন্তু আকাঙ্খা ছোট হতে পারে না। আজ উপসাগর ছেড়ে মহা-সাগরে পাড়ি দিতে চলেছে যে নিঃশঙ্ক নাবিকের দল, তাদের চক্ষে রত্নদ্বীপের স্বপ্ন থাকবেই, বকচরের চোরাবালির যন্ত্রণা তারা মর্মে মর্মে জানে।

ভারতীয় সংস্কৃতির নৃতাত্ত্বিক বনিয়াদ

—এক দল বিরহোর এসেছে! সহরের বাইরে কলেজ ময়দানের এক কোণে গাছের তলায় ডেরা নিয়েছে।

হাজারিবাগের বাংলাস্কুলের ছোট খেলার মাঠে কিছুক্ষণের জন্য খেলা থামিয়ে আমরা এই খবরটা প্রথম শুনলাম। আমাদের পরিচিত সেই সর্বঘটের সংবাদদাতা একচক্ষু চীনাবাদামওয়ালা এই সংবাদটি নিয়ে এসেছিল। বহুদিনের পুরাতন একটি ঘটনা, আমরা তখন বাংলাস্কুলের ছাত্র। আমাদের কিশোরজীবনের খেলার মাঠে হঠাৎ এক একদিন অভাবিত ভাবে এইরকম এক একটি বিপুলা পৃথ্বি ও নিরবধি [illegible] খবর শুনে আমরা চম্‌কে উঠতাম।

খবরটা শুনলাম। তারপর আর কোন কথা নয়। আমরাও পরমুহূর্তে দল বেঁধে ছুটলাম কলেজ ময়দানের দিকে। বিরহোরদের দেখলাম। একদল স্ত্রী-পুরুষ বিরহোর বসেছিল গাছতলায়। প্রায় উলঙ্গ বললেই চলে। থানার চৌকিদারগুলি বোধ হয় অনেক কষ্টে তাদের কিছু কিছু বস্ত্রতত্ত্ব বোঝাতে পেরেছে। কাঁচা পাতা আর ছেঁড়া নেকড়ার কটিবাস কেউ কেউ স্বীকার করে নিয়েছিল। শুকনো কাঁটাগাছের ঝুরি পুড়ছিল বিরহোরদের সাম্‌নে। কেউ কেউ ক্লান্ত কুকুরের মত মাটীতে লুটিয়ে শুয়েছিল। বিরহোরেরা ঘর তৈরী করতে এখনো শেখেনি। চাষ করতেও জানে না। শুধু বল্লম দিয়ে বুনো জানোয়ার মেরে খায়। মাথায় যোগীদের মত বড় বড় রুক্ষ চুলের জটা। চুল আঁচড়াতেও এরা শেখেনি। একজনের হাতে একটা লোহার টাঙ্গি দেখলাম। কিন্তু লোহার অস্ত্র এরা সাধারণতঃ ব্যবহার করে না। পাথরের কুড়ুল দিয়েই কাজ চালায়। অবশ্য, অন্য জাতের

দেখাদেখি সম্প্রতি কিছু কিছু কুড়ুল ও বল্লম ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে।

বিরহোরদের প্রথম যখন দেখলাম, তখন অবশ্য জানতাম না যে—একদল আদি ও অকৃত্রিম ভারতবাসীর দিকে আমরা তাকিয়ে আছি। আমরাই বিদেশী। আমরা ভারতবর্ষে এসেছি, বিরহোরেরা ভারতবর্ষে ছিল।

ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে। হাজার হাজার বছরের ইতিহাসের সংগ্রাম পতন ও অভ্যুদয়ের কোন চাঞ্চল্য এদের নাগাল পায়নি, স্পর্শ করতে পারেনি। অতি-প্রাক্-ইতিহাসের ভারতের একটী অপোগণ্ড মনুষ্যত্বের ছবি আজও ছোটনাগপুরের জঙ্গলের আড়ালে বেঁচে রয়েছে। সিন্ধু-গঙ্গা-সরস্বতীর প্রবাহ ভিন্নমুখী হয়ে গেছে, সুকঠিন বিন্ধ্যগিরি মাথা নীচু করে ফেলেছে, সমুদ্রের বুকে নতুন দ্বীপ ভেসে উঠে নতুন মানুষের কলরবে ভরে গেল—কিন্তু সেই প্রথম ভারতবাসীর প্রস্তরযুগ আজও শেষ হলো না। এই জগৎজোড়া পরিবর্তনের অভিনয়ে বিরহোরেরা শুধু নেপথ্যে রয়ে গেছে।

বিরহোরদের স্বচক্ষে দেখা অর্থ—ভারতের প্রস্তরযুগকে স্বচক্ষে দেখা। ভারতের সকল বিস্ময়কর দ্রষ্টব্যের মধ্যে সব চেয়ে বড় বিস্ময় বোধ হয় বিরহোর মানুষেরা। কঙ্কাল নয়, মমি নয়, ফসিল নয়—একেবারে জীবন্ত রক্তমাংসে স্পষ্ট দেহী প্রস্তরযুগ।

এই বিরহোরদের দিকে তাকিয়ে আজ আবার আমাদের ঐতিহাসিক কৌতূহল প্রশ্ন করতে চায়: সত্যিই কি তোমরা এই ভারতের ভূমিজ সন্তান? তোমাদের আগে কি আর কেউ ছিলনা? তোমরাই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রথম বেদীর সেই ঘসা-পাথরের প্রথম ইষ্টকখণ্ডটী স্থাপনা করেছিলে?

বিরহোরদের কথা বলতে গিয়ে একেবারে প্রকাণ্ড একটা বড় তত্ত্বের কথা এসে পড়েছে—ভারতীয় সংস্কৃতির কথা। ভারতীয় সংস্কৃতির কথা

বলার দুঃসাহস করতে গেলে আবার সেই আদি অধ্যায় প্রস্তরযুগের কথা এসে পড়ে। চিন্তার আনাচে কানাচে যুগ-যুগান্তের মানুষের মুখগুলি উঁকিঝুঁকি দিতে থাকে। কঠিন নিরেট প্রস্তরযুগ পাথরের স্তরে স্তরে স্তব্ধ হয়ে আছে। বিরহোরেরা সেই স্তব্ধীভূত যুগের একটী পলাতক জীবন্ত ঝরণা মাত্র। সেই বিরাট যুগের একটী ক্ষীণ নিঃশ্বাস। সংস্কৃতির কথা যে সেই বিস্মৃত যত পিতামহদের জীবনেরই কাহিনী। এ কাহিনী জানবার উপায় কি ?

হাঁ, জানবার উপায় আছে। এরই নাম অ্যান্থ্পলজী—বৈজ্ঞানিক নৃতত্ত্ব। আধুনিক অ্যান্থ্পলজী যুগান্তের অলিখিত ইতিহাসকে প্রথম গুছিয়ে লিখতে আরম্ভ করেছে। প্রস্তরযুগের কঠিন মৌনতা ভেঙে দিয়েছে। ভূপ্রোথিত করোটীর অদৃষ্টলিখা অক্লেশে পড়ে ফেলেছে। মানুষের শোণিতকণিকার পৃথ্বি-পরিক্রমার কাহিনী শুনিয়ে দিতে পারছে।

ভারতের অলিখিত মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায় খুঁজতে হলে, ভারতীয় প্রস্তরযুগের কাহিনীটি জানা চাই। প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে, ভারতবর্ষে কি কোন কালে প্রস্তরযুগ ছিল ? বিরহোরদের দিকে তাকিয়ে তার একটা প্রমাণ পাওয়া যায় মাত্র ; কিন্তু ব্যাপক কোন প্রমাণ আছে কি ?

(১) প্রস্তরযুগ : প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বের যতটুকু কাজ হয়েছে, তার মধ্যেই অজস্র প্রমাণ ধরা পড়ে গেছে যে ভারতে একদিন প্রস্তরযুগের কীর্তি ব্যাপ্ত ছিল। ভারতীয় প্রস্তরযুগের জন্তু জানোয়ারেরও কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। সিওয়ালিক গিরিমালার উপত্যকার কয়েকটী নদীবক্ষ খনন করার ফলে জীবজন্তুর ফসিল পাওয়া গেছে। ভারতীয় প্রস্তরযুগের সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় আবিষ্কার করেছেন হেলমুট ডি টেরা (Helmutt De Terra)। সিন্ধু ও ঝেলম নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ, কাশ্মীর উপত্যকা থেকে পীর পঞ্জল এবং লবণ পাহাড় এলাকায় (Salt Range) বিস্তৃতভাবে

খনন ও অনুসন্ধানের পর ডি টেরা ভারতের আদি-প্রস্তরযুগ (Paleolithic) ও নবপ্রস্তরযুগের (Neolithic) সভ্যতার অনেকগুলি অবস্থান ও নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন। ভারতীয় আদি প্রস্তরযুগের এই সংস্কৃতির একটা নামকরণও হয়ে গেছে—সোয়ান সংস্কৃতি। সোয়ান নামে একটা নদীর উপত্যকায় এই সংস্কৃতির বহুল উপচার ও উপকরণ পাওয়া গেছে। এই যুগে পাথরের ছিল্‌কা (Flake) তুলে অমসৃণ সামগ্রী তৈরী করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এই সোয়ান সংস্কৃতিই হলো পশ্চিম ঘাট, নর্মদা উপত্যকা এবং দক্ষিণ ভারতের আদি-প্রস্তরীয় সংস্কৃতির মূল আধার।

বৃহৎ-শিলার সংস্কৃতি (Megalithic culture) নামে একটা কথা আছে। প্রাচীন মানুষেরা যেখানে বসতি স্থাপন করতো, সেখানে বড় বড় পাথর গড়িয়ে এনে ঘিরে বা সাজিয়ে রাখতো। সমাধি-ভূমিও এইভাবে বৃহৎ-শিলার সমাবেশে রচিত হতো। হয়তো মানুষ জাতির নগরনির্মাণের শৈশব প্রয়াস এই ভাবেই উন্মেষিত হয়েছিল। ইতিহাসের প্রথম স্থপতিদের এই বৃহৎ-শিলাময় কীর্তি ভারতের নানা স্থানে আছে। একটা কথা আছে, এই বৃহৎ-শিলা সংস্কৃতির একটা নির্দিষ্ট যুগ নেই। কোন কোন বৃহৎ-শিলার সংস্কৃতি মূলত প্রস্তরযুগীয়। কোথাও বা পরবর্তী কালের—লোহা তামা বা ব্রঞ্জের যুগে।

কাশ্মীরে বৃহৎ-শিলার যেসব প্রাচীন জন-অবস্থানের চিহ্ন পাওয়া গেছে, সেগুলি প্রধানতঃ নব-প্রস্তর যুগের। কারণ, এখানে ঘসা পাথর ও জোড়ামাটীর (Band-Ceramic) তৈরী সামগ্রীর নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে।

মধ্য ভারত, দক্ষিণ ভারত এবং ছোটনাগপুরেও বহু বৃহৎ-শিলার অবস্থান আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু এগুলিকে পরবর্তীকালের সভ্যতার

নমুনা বলে মনে হয়। এর মধ্যে ধাতুযুগের সভ্যতার প্রমাণটাই বেশী প্রকট।

(২) ব্রঞ্জ-সংস্কৃতি (Bronze culture)। একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে ভারতে কোন ব্রঞ্জ-যুগ ছিল না। এটা ভুল ধারণা। ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে ব্রঞ্জ-যুগের একটা অধ্যায় পার হয়েছে। রাঁচী জেলার বৃহৎ-শিলার অবস্থানগুলি থেকে যেসব সামগ্রী পাওয়া গেছে, তার মধ্যে ব্রঞ্জের তৈরী জিনিসও আছে। দক্ষিণ ভারতের বৃহৎ-শিলার অবস্থানগুলি থেকে ব্রঞ্জের প্রভূত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। মধ্য ভারতের বৃহৎ-শিলার সংস্কৃতির সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের বৃহৎ-শিলার সংস্কৃতির সাদৃশ্য আছে, উভয় অবস্থানের ব্রঞ্জের মধ্যে টিনের পরিমাণ সমান [শরৎ রায়]। মহেঞ্জোদাড়ো বা সিন্ধু উপত্যকার খননের ফলে যে সব ব্রঞ্জ পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে টিনের পরিমাণ কম।

আসামে যে বৃহৎ-শিলার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তার সঙ্গে মধ্য-ভারতীয় বা দক্ষিণভারতীয় বৃহৎ-শিলার কোন সাংস্কৃতিক যোগ নেই। পশ্চিম চীন থেকে এই সংস্কৃতি আমদানি হয়েছিল [Hutton]।

এককালে পণ্ডিতেরা একরকম স্থির করেই ফেলেছিলেন যে ভারতের এই বৃহৎ-শিলার সংস্কৃতি আসলে মিশরীয় সংস্কৃতি থেকে এসেছিল। বর্তমানে এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় বৃহৎ-শিলার সংস্কৃতির সম্পূর্ণ ইতিহাস আমরা এখনো পাইনি। উত্তরপশ্চিম ভারতের বৃহৎ-শিলা হলো নবপ্রস্তর যুগের এবং মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের বৃহৎ-শিলা হলো ধাতু-যুগের। মাঝখানে একটা বড় রকমের ইতিহাস ও পরিণতির কাহিনী অজানা থেকে গেছে।

প্রস্তরযুগের ভারতীয়ের গৃহস্থালীর এক একটা নিদর্শন আমরা পেয়েছি। কিন্তু গৃহস্থ কই? সেই পাথুরে সংস্কৃতির ভারতীয় ভদ্রলোকদের

চেহারাটা কি রকম ছিল? স্যর আর্থার কীথ এই প্রাগৈতিহাসিক গৃহস্থের মূর্তিটীও খুঁড়ে বের করেছেন। সব চেয়ে প্রাচীন ভারতীয়ের খুলি আজ পর্যন্ত যা পাওয়া গিয়াছে তার মধ্যে 'বায়ানা' মানুষটাই প্রাচীনতম। আগ্রা থেকে কয়েক মাইল দূরে বায়ানা নামক জায়গায় রেলের পুল তৈরী করার সময় নদীতল থেকে ৩৫ ফুট গভীরে এই খুলি পাওয়া গিয়াছে। এই 'বায়ানা বাবাজী' কোন্ যুগের ছিলেন, তা একেবারে সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে তাঁর খুলির অস্থিত্ব একেবারে চুণত্বে পরিণত হয়ে গেছে। দ্বিতীয় ভারতীয়ের খুলিটার নাম হলো 'শিয়ালকোট খুলি'। ইনি অপেক্ষাকৃত আধুনিক—তাম্র-প্রস্তর যুগের মানুষ। খুলি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এঁরা হলেন নৃতাত্ত্বিকের 'মেডিটারেনিয়ান' গোত্রের মানুষ।

(৩) তাম্র-প্রস্তর ও তাম্রযুগ। ভারতে প্রস্তর ও ব্রঞ্জ ছাড়া, তাম্র সংস্কৃতির প্রমাণ কিছু কিছু পাই। কিন্তু তাম্র সংস্কৃতির যুগ সময় হিসাবে ভাগ করা এখনো সম্ভব হয়নি। লোহা তামা ব্রঞ্জ মৃৎপাত্র ও ঘসা পাথরের সভ্য নিদর্শন সব একসঙ্গে জড়াজড়ি করে এক একটী প্রাচীন মানুষের নিকেতনের ধ্বংসস্তূপে পড়ে আছে।

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসের প্রসঙ্গে এর পরেই হঠাৎ সিন্ধু-সভ্যতার (আনুমানিক ৪০০০—৩০০০ খৃঃ পূর্ব) কথা মনে পড়ে যেতে পারে। সিন্ধু-সভ্যতার আধার মহেঞ্জোদাড়োর (এবং হরপ্পা) মধ্যেও নব প্রস্তর যুগের সংস্কৃতির ঘসা মৃৎপাত্রের (Black Burnished Pottery) নমুনা পাওয়া গিয়েছে। তাই স্বভাবতঃ ধারণা হয় যে প্রাচীনতর একটী বৃহৎ-শিলার সংস্কৃতির অধিষ্ঠানের ওপর নতুন 'সিন্ধু-সভ্যতা' নামে একটী সভ্যতার পত্তন হয়েছিল।

সিন্ধু-সভ্যতায় লোহার চিহ্ন নেই। প্রচুর ব্রঞ্জ আছে। তাছাড়া

সোনা রূপা তামা ও সীসার ব্যবহার দেখা যায়। সিন্ধু-সভ্যতা এখনো আমাদের কাছে রহস্য হয়ে আছে। সিন্ধু-সভ্যতার লিপিগুলির এখনো পাঠোদ্ধার হয়নি। সিন্ধু-সভ্যতাকে কেউ দ্রবিড় সভ্যতা বলে প্রমাণ করতে ব্যস্ত। কেউ কেউ বলেন ঋগ্বেদোত্তর সভ্যতা। রমাপ্রসাদ চন্দ বেদ থেকে প্রমাণ উদ্ধৃত করে একটা 'সিন্ধু-জাতির' অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন। স্যর জন মার্শাল একেবারে না ভেবে চিন্তেই বলে দিলেন —এটা সুমেরীয় সভ্যতা। বর্তমানে এইসব কোন থিওরীই গ্রাহ্য নয়। সিন্ধু-সভ্যতার সীমানা এখন বহুদূর পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গিয়েছে— বেলুচিস্থানে কাথিয়াবাড়ে ইরানে এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। পঞ্জাব রাজপুতানা ও গঙ্গা উপত্যকাতেও এই সভ্যতার স্তূপচিহ্ন আছে। বিস্তৃত খননকার্য ও লিপির পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত সিন্ধু-সভ্যতার রহস্য ঘুচবে না। (অরেল স্টাইন)

মহেঞ্জোদাড়োতেও মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে। কঙ্কালগুলির নৃতাত্ত্বিক পরীক্ষার পর মনে হয়—সিন্ধু মানবেরা মেডিটারেনিয়ান গোত্র। আধুনিক এসিয়া মাইনরের অধিবাসীর সঙ্গে এদের শারীর গঠনসাদৃশ্য আছে (সিউয়েল ও গুহ)।

সিন্ধু-সভ্যতার প্রসঙ্গে এসেই ভারতীয় সংস্কৃতির একটি নতুন ও বিশিষ্ট অধ্যায় পাওয়া যায়—বহির্ভারত বা বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগের কথা। সিন্ধু-মানুষেরা যে কিশ প্রভৃতি মেসোপটেমীয় উপত্যকার প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতো তার প্রমাণ আছে। কিশ সহরে সিন্ধু-লিপির নমুনা পাওয়া গিয়েছে।

সিন্ধু-সভ্যতার সঙ্গে বৈদেশিক সভ্যতার একটা আদান প্রদান হয়তো ছিল। কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতা বিদেশ থেকে (প্রাচীন মিশর বাবিলন উর প্রভৃতি) ভারতের পশ্চিম সীমান্তে এসে ঠাঁই নিয়েছিল এমন কোন

প্রমাণ পাওয়া যায় না। সিন্ধু-সভ্যতার যুগে এবং পরে ভারতের বাইরে থেকে নানা সংস্কৃতির স্রোত ভারতে এসেছে সন্দেহ নেই। বর্তমান 'হিন্দুভারতের' বহু অবৈদিক আচার অনুষ্ঠান ও দেবদেবীর প্রমাণ সিন্ধু-সভ্যতার মধ্যে অনেকে খুঁজে পেয়েছেন। আরও একটা জানবার বিষয় এই যে হিন্দুভারতের বহু দেবদেবী মূলতঃ মেসোপটেমিয়ার দেবদেবী। নাইনিতালের নাইনিদেবীর যে মূর্তিটা এখনো রয়েছে, তাকে ভারতীয় বলতে অনেকের বাধবে। ইনি ব্যাবিলনবাসিনী এবং ভারত-প্রবাসিনী বলেই মনে হয়।

মহেঞ্জোদাড়োর প্রসঙ্গের পর স্বভাবত আর্য আগমনের কথা এসে পড়ে; কারা এই আর্য, কোথা থেকে এল, সভ্য ছিল না অসভ্য ছিল, এদের কোন লিপি ছিল কি ছিল না—পণ্ডিতদের মধ্যে এই নিয়ে বিতণ্ডার অন্ত নেই। আর্যেরা সভ্য থাক বা অসভ্য থাক—আর্যদের ভাষা যে ভারতময় ছড়িয়ে পড়লো সেটাই ইতিহাসের পক্ষে সবচেয়ে বড় ঘটনা। আর্যভাষার ইতিহাসের মধ্যে আর্য তথা আর্যভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস লুকিয়ে আছে।

বৈদেশিক আক্রমণ বা আগমন ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের তৃতীয় অধ্যায়।

কিন্তু প্রথম আগমন বা আক্রমণ কোনটা? আর্যেরাই কি ভারতের প্রথম আগন্তুক?

সম্প্রতি এ বিষয়ের নতুন একটি বিস্ময়কর—আবিষ্কার হয়েছে। ভারতে আর্যভাষীরাই প্রথম আগন্তুক নয়। তার আগে আর একটা ভাষার (সুতরাং ভাষীর অর্থাৎ সাংস্কৃতিক জাতির) আগমন বা আক্রমণ হয়েছিল।

এখানে খাঁটি নৃতাত্ত্বিক (Anthropological) জাতির আগমনের

কথা তুললে গোলমালে পড়তে হইবে। মেডিটারেনিয়ান, নেগ্রিটো আলপাইন ও প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড ইত্যাদি দেহগঠন-গত মূল নরগোষ্ঠীদের কথা এক্ষেত্রে আসে না। ভারতের মানুষের রক্তে ও খুলিতে এই গোষ্ঠীদের সংমিশ্রণের ইতিহাসে রয়েছে। হয়তো বিশ হাজার বছর অতীতে এরা ভারতে এসেছে, চলে গেছে, আবার এসেছে। কোন গোষ্ঠী হয়তো ভারতের মাটিতেই প্রাণিত্ব থেকে নরত্বের স্তরে পৌঁছেছিল। বির্‌হোরদের সেই জীর্ণ মানবীয় মূর্তিগুলি আমরা এখনো ভুলে যাইনি। এ ইতিহাস নিতান্তই অন্ধকার যুগের। প্রাণিতত্ত্বের ইতিহাসের মত সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে এই ইতিহাসের নিকট ও নিগূঢ় সম্পর্ক নেই।

তাই সংস্কৃতির আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে ভাষার আগমনের কথাই বিচার করবো। সেই বিচারে আর্যভাষীরা ভারতে প্রথম আগন্তুক নয়। আর্যদের আগে, এমন কি সিন্ধু-সভ্যতারও আগে ভারতে একটী বিরাট ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃতিবান মানুষের আগমন হয়েছে—মুণ্ডারি সভ্যতা।

(৪) মুণ্ডারি অর্থাৎ মুণ্ডাদের সভ্যতা। কারা এরা? কোথা থেকে এরা এল? আমরা জানি ছোটনাগপুরের ও উড়িষ্যায় আরণ্য অঞ্চলে মুণ্ডারা থাকে, যাদের আদিবাসী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি যে সব তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে এঁদের আর আদিবাসী বলা যায় না। বড় জোর বনেদী বা প্রাচীন অধিবাসী বলা যায়।

মুণ্ডারি সম্বন্ধে ঐ সংস্কৃতিতত্ত্বের লেখকদের এবং আরও অনেকের ধারণা যে তারা ভারতের পূর্বদিক থেকে ভারতে এসেছে। তাদের ভাষা হলো 'অস্ট্রিক' ভাষা (মন্‌ খ্‌মের প্রভৃতি)। এটা শ্মিট (Schmidt) নামে এক পণ্ডিতের আনুমানিক সিদ্ধান্ত মাত্র।

কিন্তু নতুন তথ্য আবিষ্কারের পর আমাদের আজ হঠাৎ সন্দেহ

হয়েছে—আমাদের এই আদিবাসী আখ্যাত মুণ্ডারাও য়ুরোপীয়ান। ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা মুণ্ডারি ভাষার বিচার করে দেখেছেন যে এই ভাষা মূলতঃ ফিনো-উগ্রিয়ান (Finno-Ugrian) বর্গের ভাষা। [ফিনো-উগ্রিয়ান বর্গ অর্থাৎ—হাঙ্গারিয়ান ম্যাগিয়ার, ভোগাল, উরাল, ওস্টিয়াক, কাজানের চেরেমিস, ফিনল্যাণ্ডের ফিন এবং মোদিন (নিজ্‌নি নভোগোরোদ) ভাষার সমবায়] মুণ্ডারি শ্রেণীর ভাষা অর্থ—মুণ্ডারি খরিয়া হো সাঁওতাল প্রভৃতি ভাষা বোঝায়। কেউ কেউ একে কোল বর্গের (বা Kolarian group) ভাষা বলেন। মুণ্ডারি ও সাঁওতালী ভাষার সঙ্গে ফিনো-উগ্রিয়ান ভাষার অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। মুণ্ডাদের মধ্যে প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে তারা পশ্চিম থেকে পূর্বদেশে এসেছে। মুণ্ডা-সাঁওতালদের সঙ্গে ফিনো-উগ্রীয় জাতিদের সংস্কৃতিগত আচার অনুষ্ঠানেরও সাদৃশ্য আছে (De Hevesy)।

(৫) ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনায় 'দ্রাবিড়' কথাটা বরাবর একটা গোলমাল সৃষ্টি করে এসেছে। দ্রাবিড় বলতে বিশিষ্ট কোন নরবংশ বা নৃতত্ত্বগত জাতি বোঝায় না। রিজলি সাহেব এই গোলমাল সৃষ্টি করে গেছেন। দ্রাবিড়ভাষীদের একটা 'জাতি' কল্পনা করে নিয়ে তিনি দ্রাবিড় কথাটাকে অ্যানথ্রপলজীর বিচারে নিয়ে এসে উৎপাত করেছেন। বর্তমানে দ্রাবিড় কথাটা ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়েও গোলমেলে হয়ে উঠেছে।

দক্ষিণ ভারতের তামিল, কানাড় বা কর্ণাট, তেলেগু ও মালয়লম্—এই তিন ভাষাই প্রধানতঃ দ্রাবিড় বর্গের ভাষা। এই ভাষীরা কিন্তু জাতিগত ভাবে এক নয়। এই জাতিরা কবে এসেছে, তার প্রমাণ আমরা পাই না। কিন্তু এই দ্রাবিড় ভাষার মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক অভিযানের ইতিবৃত্ত লুকিয়ে আছে। দ্রাবিড় ভাষার মধ্যে উরালিয়ান (Uralian) ভাষার

শব্দ ও গঠনের প্রভাব ও সাদৃশ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। তিনেভেলী জেলায় আড়িতানাল্লুর নামে জায়গায় যে এক প্রাচীন সংস্কৃতির ভগ্নস্তূপ পাওয়া গেছে, তাকেই দ্রাবিড় সভ্যতার প্রাচীনতম নমুনা বলা হয়। আড়িতানাল্লুর হলো দ্রাবিড় সভ্যতার মহেঞ্জোদাড়ো। উরাল ভাষার প্রভাব দ্রাবিড় সভ্যতার বৈদেশিকতা প্রমাণ করিয়ে দেয়। উরালীয় ভাষীদের সংস্কৃতির সঙ্গে ভূমিজ মানুষের (Autochthonus) প্রস্তরীয় সংস্কৃতির সমন্বয় কি দ্রাবিড় সভ্যতার বেদী ?

(৬) লৌহযুগ : আর্য ও আর্যোত্তর সংস্কৃতি। সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শনের বয়স থেকে বৌদ্ধ সভ্যতার উদ্ভব পর্যন্ত একটানা ২০০০ বছরের ইতিহাস আমাদের কাছে অস্পষ্ট। এরই মধ্যে লৌহযুগ আরম্ভ হয়ে গেছে। এরই মধ্যে আর্যেরা (অথবা ইণ্ডিড বা Indid) ভারতে এসেছে। আর্য্য ভাষার প্রসার হয়েছে। আর্য সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছে এবং কালক্রমে সারা ভারতের সংস্কৃতির মূর্তি আচ্ছন্ন করে ফেলেছ। আর্যভাষী আলপাইন এবং আর্যভাষী মেডিটারেনীয়ান, উভয় জাতির শে. ভারতে এসে ছড়িয়েছে। দ্রাবিড় এবং মুণ্ডারিদের মধ্যে অস্ট্রেলয়েড প্রাধান্য স্পষ্ট।

ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে পূর্বের চেয়ে পশ্চিমের সঙ্গেই আগে মিতালী হয়েছে। সিন্ধু-সভ্যতার সঙ্গে মেসোপটেমিয়ার অতি প্রাচীন সম্পর্কের কথা ছেড়ে দিলেও, তার পরবর্তী কালে পশ্চিমের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের লিখিত ইতিহাসের প্রমাণ আমরা পাই।

খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে পারস্য ও মিশরের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের কথা আমরা পাই। এর চেয়ে পুরনো খবর পাই না। ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের ও সিন্ধুর একাংশ একদিন পারস্য সম্রাট দারিয়ুসের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এর পর ভারতে গ্রীক-অভিযান ও হেলেনীয়

সংস্কৃতির আবির্ভাব। গ্রীক সম্পর্কের মারফৎ ভারতের সঙ্গে মিশরের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। টলেমির সময়ে ভারতের বৌদ্ধ শিল্পের প্রভাব মিশর দেশের শিল্প ও স্থাপত্যকে খুবই প্রভাবান্বিত করেছিল।

এর পর ভারতের সঙ্গে রোমক সাম্রাজ্য ও সভ্যতার বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের অধ্যায়। এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ফলে উভয় দেশের সংস্কৃতিতে নতুন সৃষ্টি ও উৎসাহের সাড়া জেগে ওঠে। দর্শন গণিত জ্যোতিষ নাট্য এবং নৌবিদ্যা প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ে ভারত ও রোমের সাংস্কৃতিকতা এই যোগাযোগের ফলে উন্নত হয়।

ভারতের সঙ্গে পূর্বের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বেশী দিনের কথা নয়। চীনের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সাধারণতঃ একটা যুক্তিহীন অতি-বিশ্বাস প্রচলিত আছে। স্যর অরেল স্টাইন এবং ডি সস্যুরে'র (De Saussure) মত পণ্ডিতেরা চীন সভ্যতার এই অতি-প্রাচীনত্বকে অতিরঞ্জিত সত্য বলে মনে করেন। ভারতের সঙ্গে চীনের মৈত্রীও খুব পুরাতন কাহিনী নয়। চীনের হান্ রাজত্বের (২০২খৃঃ পূর্ব—২২১ খৃষ্ট পর) পূর্বে চীন ও ভারতের সম্পর্কের কোন ঘটনার কথা পাওয়া যায় না। কৌটীল্যের অর্থশাস্ত্রে (খৃঃ পূর্ব ৪র্থ শতক) 'চীনভূমি' নামে একটা কথা আছে। কিন্তু এই 'চীন' কথাটা বর্তমান চীন বোঝায় কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। চীনবিদ্যাবিশারদেরা (Sinologist) ভারতীয় চীন কথাটার ঐ অর্থ স্বীকার করেন না। সম্ভবতঃ চীন অর্থে মধ্য এশিয়ার মত অন্য কোন 'রেশমের' দেশ বোঝাতো।

খৃষ্ট পর প্রথম শতকে কুশানদের (চীন-তুর্কীস্থান থেকে) সঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিচয় ঘটে। কুশানেরা ভারতে রাজ্য স্থাপন করে। এই সময় ভারতবর্ষের সঙ্গে এশিয়ার উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব দেশের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের অধ্যায় ভালভাবে আরম্ভ হয়।

এর পর 'দ্বীপময় ভারতের' ওপর ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক বিস্তারের অধ্যায়—যব বলি সুমাত্রা আনাম প্রভৃতি দেশে।

অতি-প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে পূর্বদিক থেকে একটী মাত্র ভাষাবান জাতির আগমন বা আক্রমণ কল্পনা করা যায়। এই জাতি হলো স্মিট-কথিত 'অস্ট্রিক' (অর্থাৎ অস্ট্রোএসিয়াটিক, অর্থাৎ মন্-খ্মের-ভাষী অর্থাৎ ইন্দো-চীনবাসী একটী জাতি) জাতির আগমন। পার্বত্য আসামে মন্-খমের ভাষার অর্থাৎ অস্ট্রিক সংস্কৃতির বুনিয়াদ খুঁজে পাওয়া যায়।

সংস্কৃতিময় ভারতভূমির ঐতিহাসিক আচরণের একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা মাত্র আমরা করলাম। এর মধ্যে একটী শিক্ষনীয় তথ্য আছে। পশ্চিমের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক মিতালী হয়েছে আগে, তারপর হয়েছে পূর্বদেশের সঙ্গে। চীন, মধ্য এসিয়া ও দ্বীপময় ভারত প্রভৃতি পূর্বদেশ থেকে ভারত কোন সংস্কৃতি গ্রহণ করেনি। এবিষয়ে ভারত শুধু দাতা মাত্র এবং চীন প্রভৃতি পূর্বীয় জাতিরা গ্রহীতা মাত্র। পশ্চিমের সঙ্গেই ভারতের আদান ও প্রদান হয়েছে। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম, দু'পাশের এই দুই সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতের মিতালির ফল রাজনীতির দিক দিয়ে একই রকম হয়নি। পশ্চিম বার বার তার সাংস্কৃতিক বন্ধু ভারতবর্ষকে আক্রমণ করে গায়ের জোরে দাসরাষ্ট্র করে রাখার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পূর্বদিক থেকে এই চেষ্টা হয়নি। চীনের সাম্রাজ্যবাদ পরবর্তী কালে তিব্বত ও ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত মাত্র অগ্রসর হয়েছিল।

আধুনিক নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের যুক্তপ্রয়াস আমাদের সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ ও ঐতিহ্যকে যত অনুমানের ভ্রম থেকে উদ্ধার করবে, এ বিশ্বাস আমরা রাখতে পারি। সেই কাজ মাত্র আরম্ভ হয়েছে। 'আমাদের জাতীয় চরিত্রের ঐতিহাসিক প্যাটার্ণটুকু বুঝতে পারলে, আমাদের

বর্তমান সামাজিকতাও ভ্রমমুক্ত হবে নিঃসন্দেহ। আমরা জানি, সামাজিক গোঁড়ামিই সাংস্কৃতিক মৃত্যুর সবচেয়ে বড় কারণ। নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব আমাদের এই গোঁড়ামিকে ভেঙে ঐতিহাসিক পরিচয়টুকু বুঝিয়ে দেয়। সেইখানেই আমাদের পরম লাভ। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের নৃতাত্ত্বিক গবেষণা এই রকম কোন সামাজিক বা সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্য নিয়ে দেখা দেয়নি। ভারতে নৃতত্ত্বের চর্চা ব্রিটিশ শাসনের রাজনীতিক উদ্দেশ্যের সাহায্যের জন্যই আরম্ভ হয়। [Treatises on tribes and castes have been compiled in various provinces in India ......under orders of local governments, not so much in the interest of anthropological research, but as indispensable aids to the work of civil administration. And the wants of the Magistrate and Collector and those of the anthropologist are very different.—Crooke]

রাষ্ট্রীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিজের হাতে না থাকলে আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের গবেষণা নৃতত্ত্বের আবিষ্কার ও প্রত্নতত্ত্বের ঐতিহাসিক ইঙ্গিত সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমাদের সংস্কৃতিকে কোন নবতর পরিণামের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজে এই সব তথ্য ও তত্ত্বকে সার্থক করতে পারবো না। ভারতের সাংস্কৃতিক অভ্যুদয়ের পথে সব চেয়ে বড় বাধা এইখানে। এই আক্ষেপের শেষে আমাদের ছেলেবেলার দেখা সেই দীন বির্‌হোরদের মূর্তিগুলিই আবার মনের ভেতর নতুন করে ভেসে ওঠে। এই বির্‌হোরদের জঙ্গলেই আজ টাটানগরের ব্লাস্ট ফার্নেসে বিংশ শতাব্দীর ইস্পাত সভ্যতা প্রখর হয়ে জ্বলছে। তারই চারিদিকে জঙ্গলের নিভৃতে আদি ভারতের আত্ম বির্‌হোরেরা আজও ঘুরে বেড়ায় পাথরের কুড়ুল নিয়ে। অর্ধলক্ষ বছরের ব্যবধান বজায়

রেখে পাশাপাশি দুই সভ্যতা চলেছে। অথচ, চেষ্টা করলে এক বছরের মধ্যে এই অর্ধলক্ষ বছরের ব্যবধানকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়। ভারতের রাষ্ট্রীয় শাসনে যদি সাংস্কৃতিকতা বা সমাজ মঙ্গলের কোনো উদ্দেশ্য থাকতো, তবে আজ নিশ্চয় দেখতে পেতাম যে আমাদের সেই দুঃখী ও অর্দ্ধনগ্ন প্রস্তর-মানব বিরহোরেরা সবাই সভ্যতম ইস্পাত-মানব হয়ে গেছে।